MA-09-BENG-3.2

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
**Gauhati University**
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
**Institute of Distance and Open Learning Learning**

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
**M. A. in Bengali**

তৃতীয় ষাণ্মাসিক

# দ্বিতীয় পত্র (Paper : 2)
# বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য

## বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

বিভাগ - ১ : উজ্জ্বলনীলমনি—নায়িকাভেদ প্রকরণ, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ (পূর্বরাগ)

বিভাগ - ২ : চৈতন্যচরিত কাব্য— কৃষ্ণ-রাধা-গৌরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

বিভাগ - ৩ : চৈতন্যচরিত কাব্য — বেদান্ত বিচার, শিক্ষাষ্টক

বিভাগ - ৪ : শাক্ত পদাবলি— আগমনি ও বিজয়া

**Contributor :**

| | |
|---|---|
| Ms. Nibedita Bhattacharjee<br>(Units: 1, 2, 3, 4, 5 & 6) | Department of Bengali<br>R. G. Baruah College, Guwahati |
| Dr. Alak Saha<br>(Units: 7 & 8) | Department of Bengali<br>Tura Govt. College, Meghalaya |

**Course Co-ordination :**

| | |
|---|---|
| Prof. Kandarpa Das | Director, GUIDOL |
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |
| Dipankar Saikia | Editor Study Material<br>GUIDOL |

**Content Editing :**

| | |
|---|---|
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |

**Proof Reading & Language Editing :**

| | |
|---|---|
| Sanjoy Chandra Das | Assistant Professor<br>Department of Bengali<br>Pandu College, Guwahati |

**Format Editing :**

| | |
|---|---|
| Dipankar Saikia | Editor Study Material<br>GUIDOL |

**Cover Page Design**

| | |
|---|---|
| Bhaskar Jyoti Goswami | GUIDOL |

ISBN : ??????????????????????????

October, 2014

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset, Mirza, Copies printed 500.

**Acknowledgement**

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

# পত্র পরিচিত

স্নাতকোত্তর তৃতীয় ষাণ্মাসিকের অন্তর্গত দ্বিতীয় পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও দর্শনের আকরগ্রন্থ শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনী তথা বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শন-গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এবং শাক্ত পদাবলি। আসুন, এই সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এই পত্রের অধ্যয়ন এবং পঠন পাঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করা যাক।

আপনাদের পাঠ্যতালিকায় রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'। এই গ্রন্থে শ্রীরূপাচার্য প্রাচীন আলংকারিকদের বর্ণিত রসের অতিরিক্ত 'ভক্তি'রসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ভক্তি একমাত্র কৃষ্ণভক্তি। এই ভক্তিরসকে পাঁচভাগে ভাগ করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তিরূপে শ্রীরূপ গোস্বামী 'মধুরভক্তি'কেই নির্দেশ করেছেন। এই মধুর ভক্তিরস প্রাচীন আলংকারিকগণ বর্ণিত লৌকিক শৃঙ্গাররসেরই এক দিব্যরূপ। পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত 'উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে এরই সবিশেষ বিশ্লেষণ ভাষারূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে যে নতুন সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা সমকালীন প্রথানুবর্তী গতানুগতিক ভাবপরিমণ্ডলের মধ্যে মানবিক মহত্ত্ব ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শে নতুন জীবনচেতনায় বাংলা সাহিত্যের দিকপরিবর্তন সূচিত করেছে। মহাপ্রভুর জীবনকে কেন্দ্র করে যেসব চৈতন্যচরিত কাব্য সৃষ্টি হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মহাপ্রভুর জীবনী বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা করেন বৃন্দাবনদাস। তিনি তাঁর কাব্যে মহাপ্রভুর প্রথম জীবনের লীলা বর্ণনা করেন। মহাপ্রভুর অন্ত্যজীবনের লীলারস আস্বাদনের জন্য উৎসুক ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে সেই ভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস গোস্বামীগণের আদেশানুসারে রচনা করেন 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। তিনি চৈতন্যজীবনকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর কাব্যে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়োগ করেছেন। তিনিই প্রথম সরলভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের জন্য চৈতন্যদর্শনের আনুষ্ঠানিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থ রসমণ্ডিত নিঃসন্দেহে— কিন্তু রস যে বস্তুকে ধারণ করে আছে তা শুধু চিরনতুন চিররহস্যময় মানবজীবনের লীলাবৈচিত্র্য নয়— তা সম্প্রদায় বিশেষের দুরূহ তত্ত্ব। প্রেমতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, চৈতন্যতত্ত্ব, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ, জীবতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্বের এমন সহজ সরল ও নিপুণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা অন্যত্র দুর্লভ।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পাশাপাশি এই পত্র স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা শাক্ত পদাবলি। শাক্ত সাহিত্যের পিছনে রয়ে গেছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাক্ত-সাধনা ও মাতৃদেবী পূজার সুদীর্ঘ ইতিহাস। শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্গত শ্যামা-সংগীত, উমা সংগীত তথা আগমনি-বিজয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগমনি ও বিজয়া পর্বের পদগুলি বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই পর্বের আধুনিক ও প্রাচীন মিলিয়ে অনেক কবি রয়েছেন যদিও রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এঁদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয়। এঁদের কাব্য-কলা-কৌশলের মাধ্যমেই আমরা শাক্ত পদাবলির সর্বাঙ্গীন ধারণায় উপনীত হতে পারি। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বক্ষমান পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহকে কয়েকটি বিভাগে বিভাজিত করেছি। আসুন, আমাদের পাঠ্য-বিষয়ের বিভাগ-গত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক —

**বিভাগ - ১** : **উজ্জ্বলনীলমনি—নায়িকাভেদ প্রকরণ, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ (পূর্বরাগ)**

**বিভাগ - ২** : **চৈতন্যচরিত কাব্য— কৃষ্ণ-রাধা-গৌরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব**

**বিভাগ - ৩** : **চৈতন্যচরিত কাব্য — বেদান্ত বিচার, শিক্ষাষ্টক**

**বিভাগ - ৪** : **শাক্ত পদাবলি— আগমনি ও বিজয়া**

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তা ছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো, মোট ২০ নম্বরের (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর বাড়ি থেকে তৈরি করে (Home Assignment) পাঠাতে হবে। এছাড়া, বার্ষিক পরীক্ষায় আপনাদের ১২ নম্বরের ৫ টি প্রশ্ন (১২×৫=৬০) এবং ৫ নম্বরের ৪ টি প্রশ্নের (৫×৪=২০) উত্তর লিখতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যমান ৮০ (৬০+২০) ।

আশা করি এই উপকরণসমূহ আপনাদের কাছে উপযোগী ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

# বিভাগ পরিচিত

স্নাতকোত্তর তৃতীয় ষাণ্মাসিকের অন্তর্গত দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্য-সূচিতে রয়েছে — উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাকাব্য এবং শাক্ত পদাবলি। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত এই রচনাগুলির বিষয়বস্তুকে আমরা মোট আটটি বিভাগে ভাগ করেছি। 'উজ্জ্বলনীলমনি'কে নিয়ে রয়েছে মোট দুটি ভাগ। যেমন —

**বিভাগ - ১ : উজ্জ্বলনীলমনি : নায়িকাভেদ প্রকরণ**

**বিভাগ - ২ : উজ্জ্বলনীলমনি : শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ**

তারপর আরও চারটি বিভাগে আমরা ভাগ করেছি 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের বিষয়বস্তুকে। যেমন —

**বিভাগ - ৩ : চৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণ-রাধা-গৌরতত্ত্ব**

**বিভাগ - ৪ : চৈতন্যচরিতামৃত : সাধ্য সাধন-তত্ত্ব**

**বিভাগ - ৫ : চৈতন্যচরিতামৃত : বেদান্ত বিচার**

**বিভাগ - ৬ : চৈতন্যচরিতামৃত : শিক্ষাষ্টক**

বাকি দুটি বিভাগে আমরা 'শাক্তপদাবলি'র বিষয়বস্তুকে আলোচনা করেছি। বিভাগ দুটি হল —

**বিভাগ - ৭ : শাক্ত পদাবলি : সাধারণ পরিচিতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ**

**বিভাগ - ৮ : শাক্ত পদাবলি : কবি-কৃতিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**

# বিভাগ-১
# উজ্জ্বলনীলমণি
## উজ্জ্বলনীলমণি : নায়িকাভেদ প্রকরণ

### বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১.২ 'উজ্জ্বলনীলমণি' : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি
১.২.১ গ্রন্থকারের পরিচয় ও গ্রন্থাবলি
১.২.২ 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ বিশ্লেষণ
১.৩ নায়িকাভেদ প্রকরণ
১.৪ অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়
১.৫ 'উজ্জ্বলনীলমণি'-ধৃত অভিসার এবং বৈষ্ণব পদাবলি
১.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
১.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
১.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ১.০ ভূমিকা (Introduction)

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটি শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী-বিরচিত অখিল রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুর রসের বিজ্ঞান-শাস্ত্র। এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থেরই পরবর্তী অংশ। প্রেমরসময় ভগবান শ্রীগোবিন্দের ভজন করতে হলে গোপী-আনুগত্যে আদর, সোহাগ ও মাধুর্যাদি নিয়ে তাঁর কাছে যেতে হয়। গোপীদের প্রেমানুরাগ বা প্রেমমাধুরী ইহলোকে সুদূর্লভ, তাঁদের প্রীতির কথা ভাষায় প্রস্ফুটিত করা যায় না, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে সেই অত্যুজ্জ্বল ব্রজরসের যে আভাসচ্ছায়া প্রকাশ করেছেন, তার বিন্দুমাত্র আস্বাদনেও মনুষ্যলোক চরিতার্থ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ- প্রাপ্তির জন্য গোপীগণের হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ, প্রগাঢ় আকর্ষণ এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে অতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় তাঁদের হৃদয়ে অনুরাগস্রোত কী প্রকারে শত শত উত্তাল স্রোত তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, এই গ্রন্থে তারই সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে। গোপীদের হাব-ভাব-বিলাস-বিলাপ-স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বিষাদ-দৈন্য-নিমেষের অসহিষ্ণুতা-বিপ্রলম্ভ-পূর্বরাগ-লালসা-উদ্বেগ-প্রেমবৈচিত্ত্য-মান-সম্ভোগ-রাস প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত ও পরিবেশিত হয়েছে। উন্নতোজ্জ্বল রসগর্ভা প্রেম-ভক্তির এমন সমুজ্জ্বল ও সুমধুর উপদেশ জগতের আর কোনো গ্রন্থে কখনো দেখা যায় না। বস্তুত, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'

ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'---- শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রণীত এই দুই গ্রন্থকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের বেদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবারে আমরা এই গ্রন্থদ্বয়ের গ্রন্থকার তথা বৈষ্ণব ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

শ্রীরূপ গোস্বামী-রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বেদসম। প্রেমরসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজগোপীদের অলৌকিক প্রেমের রসতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে-কথা তাঁর কবিতায় বলেছেন — "যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা"— সেই প্রেমতত্ত্বের কথাটিই বহুপূর্বে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে রসতত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রেমতত্ত্বের মাধ্যমে রচয়িতা প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও করেছেন।

## ১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাঁর সমসাময়িক যুগে এবং তার উত্তরকালে যে সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল, তা বাঙালির সারস্বত সাধনার এক গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। তৎকালীন সংস্কৃত রসশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হল বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থখানিই আলোচিত হয়েছে এই বিভাগে। আপনাদের পাঠ্যতালিকায় নির্দিষ্ট হয়েছে এই গ্রন্থের দুটি প্রকরণ — নায়িকাভেদ প্রকরণ এবং শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিভাগে 'নায়িকাভেদ প্রকরণ'- এর সঙ্গে তথ্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে 'কবিপরিচিতি' এবং 'গ্রন্থ বিশ্লেষণ'। সুবিশাল 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থখানির কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দুটি প্রকরণের মাধ্যমে যে আলোচনা এবং জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারত, সেই ভাবনাকে মনে রেখেই কবি এবং কাব্য সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে সামগ্রিক বিশ্লেষণের অবকাশ কম থাকলেও কবি এবং তাঁর কাব্য সম্পর্কে আপনাদের মনে একটি সাধারণ ধারণা গড়ে উঠবে। এর ফলে আলোচ্য অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হয়েছে , তা থেকে আপনারা জানতে পারবেন —

- গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনের পরিচয় এবং তাঁর গ্রন্থাবলির পরিচয়।
- 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের সামগ্রিক পরিচয়।
- শ্রীরূপ গোস্বামী-কৃত বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র-সম্মত মধুর রসের অন্তর্গত নায়িকাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন ও তাঁদের বিশ্লেষণ।
- 'উজ্জ্বলনীলমণি' ধৃত অভিসার এবং বৈষ্ণব পদাবলির অভিসারের সাদৃশ্য ও পার্থক্য।

## ১.২ 'উজ্জ্বলনীলমণি' : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

এবার প্রথমেই আমরা 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের রচয়িতা এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি তথা 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় গ্রহণ করব।

### ১.২.১ গ্রন্থকারের পরিচয় ও গ্রন্থাবলি

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর একতম।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র, বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর আর একজন খ্যাতনামা শ্রীজীব গোস্বামীর লেখা আত্মবংশ পরিচিতি রচনার মাধ্যমে শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবন-কাহিনির সবিশেষ জানা যায়।

শ্রীরূপ গোস্বামীর পিতার নাম কুমার দেব। শ্রীরূপ গোস্বামীর বহু ভ্রাতার মধ্যে দুই ভ্রাতা সনাতন এবং অনুপম বিশেষ প্রসিদ্ধ। পিতার মৃত্যুর পর এঁরা গৌড়ের রাজধানীর নিকটে অবস্থিত সাকুর্মা নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলাশ্রয়ে থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। ২৪-২৫ বৎসর বয়সে শ্রীরূপ এবং সনাতন গৌড়রাজ হুসেন শাহের মন্ত্রীত্ব বরণ করে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন।

শ্রীরূপের সময় সীমা আনুমানিক ১৩৯২-১৪৭৬ শক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে যাবার সময় যখন রামকেলিতে শুভ বিজয় করেন তখন শ্রীরূপ ও সনাতন রাজপোষাক ত্যাগ করে দীনহীন বেশে তাঁর চরণ দর্শন করে কৃতার্থ হন-এবং তখন থেকে এঁদের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য এবং ভগবানের প্রতি অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন-বার্তা শুনে শ্রীরূপ অনুপমের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাত্রা করে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে দশদিন নিজের কাছে রেখে রস-ভক্তি-প্রেম-তত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়ে আত্মশক্তি সঞ্চারিত করে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার-এই দুই কর্মের জন্যই বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে উপদেশ দেন। প্রয়াগ থেকে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে যান এবং সেখান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিষয়-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে আবার নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-অনুরাগে গৃহত্যাগ, দৈন্য এবং বিষয়-বৈরাগ্যাদি সর্বজন-প্রসিদ্ধ। নরোত্তম ঠাকুর তাঁকে যথার্থই "শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-স্থাপক" বলে কীর্তন করেছেন।

গৌড়দেশে থাকার সময়ই শ্রীরূপ 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটকের রচনা বিষয়ে উৎসাহী হন। মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্য ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রীরূপের রচনা শুনে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দ লাভ করেন। সর্বশক্তি সঞ্চার করে মহাপ্রভু তাঁকে আবার শ্রী-বৃন্দাবনে আচার্য পদ দিয়ে পাঠিয়ে স্বাভীষ্ট পূর্তি করেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থগুলির নাম হল— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, লঘু-ভাগবতামৃত, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, নিকুঞ্জরহস্যস্তব , স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা, মথুরা-মাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, দানকেলিকৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি-বিধি, প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী, নাটক-চন্দ্রিকা ইত্যাদি।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিধর্ম প্রচারের সহায়ক ছিলেন তাঁর অনুচর ও ভক্তেরা। নবদ্বীপ তথা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহু আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনই তাঁর বাণী। অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও নিজের ধর্ম সম্পর্কে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। শিষ্যদের উপদেশের মাধ্যমেই তিনি নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর ধর্মমত ও সাধনার আদর্শ প্রচার করেন তাঁর অনুচরবর্গ।

শ্রীরূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট— বৃন্দাবনের এই ষড়্ গোস্বামী চৈতন্যদেবের ভক্তশিষ্য ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করে আবেগাপ্লুত চৈতন্যভক্তিভাবের ধর্মকে একটা সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের এই সংস্কৃত গ্রন্থের জন্যই চৈতন্য-ভক্তিধর্মের আদর্শ বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ববাদ সর্বভারতীয় বিদ্বজ্জন সমাজে প্রচার লাভ করে।

শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। হুসেন শাহের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন রূপ-সনাতন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও কৃপাধন্য হয়ে তাঁরা রাজকার্য, পদমর্যাদা ও সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে মহাপ্রভুর অনুগামী হন। গৃহত্যাগ করবার পর প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পান। সেখানে মহাপ্রভু তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেন। এরপর বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি ভক্তিগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। কাব্য, নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্র, রসতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্র— এই সকল বিষয়েই যদিও শ্রীরূপ উৎকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তথাপি মূলত তিনি ছিলেন কবি। কাব্যসাধনার মাধ্যমেই তিনি ভক্তিরসকে পরিস্ফুট করেছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থখানি তারই ফলশ্রুতি।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবন ও গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

## ১.২.২. 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ বিশ্লেষণ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বৈষ্ণব ভক্তি ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রণয়ন করবার জন্য। সেই নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি ও শৃঙ্গার রসকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'

গ্রন্থে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রথম দিকেই তিনি বলেছেন—

"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোহতিরহস্যত্বাৎ।

পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতেহত্র মধুরঃ।।"

অর্থাৎ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্যরসের বর্ণনাকালে অতি গূঢ় প্রযুক্ত মধুর রস সংক্ষিপ্তরূপে বলা হয়েছে। এই 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পৃথক ও বিস্তারিতরূপে মধুরাখ্য ভক্তিরসরাজ বর্ণিত হচ্ছে।

অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই এই দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বিভিন্ন প্রকরণ পাই। যেমন --- নায়কভেদপ্রকরণ, সহায়ভেদ প্রকরণ, শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণ, শ্রীরাধা প্রকরণ, নায়িকাভেদ প্রকরণ, যূথেশ্বরীভেদ প্রকরণ, দূতীভেদ প্রকরণ, সখি-প্রকরণ, হরিবল্লভা প্রকরণ, ইত্যাদি।

নায়কভেদ প্রকরণের বিষয়াবলম্বন হলেন নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ। ধীরোদাত্ত, ধীর-ললিত, ধীর-শান্ত আদি ভেদে নায়ক ৯৬ প্রকার। শ্রীকৃষ্ণে এই ৯৬ প্রকার নায়কগুণই ব্রজলীলায় বিরাজমান।

সহায়ভেদ প্রকরণে চেট, বিট আদি পাঁচ প্রকার নায়ক-সহায়ের কথা বর্ণিত আছে। শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে ১৩ প্রকার হরিপ্রিয়া বর্ণনা আছে। এঁদের মধ্যে নিত্যপ্রিয়া হলেন শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রমুখ।

শ্রীরাধা প্রকরণে সর্বশক্তিবরীয়সী এবং হ্লাদিনী সারভূতা মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার কথা বলা হয়েছে। তিনি সুষ্ঠুকান্তস্বরূপ, ষোড়শ শৃঙ্গারধৃতা, দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। তাঁর প্রধান ২৫টি গুণ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বিবৃত হয়েছে। সখি, নিত্যসখি, প্রাণসখি, প্রিয় সখি, পরমশ্রেষ্ঠসখিভেদে শ্রীরাধার সখিগণ পঞ্চবিধ।

নায়িকাভেদ প্রকরণে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী গোপিগণের পরোঢ়াত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়েছে। রসশাস্ত্রে স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণীভেদে তিন প্রকার নায়িকার উল্লেখ থাকলেও সাধারণী নায়িকাকে ধরা হয়নি। স্বকীয়া, পরকীয়াভেদে নায়িকা মোট ১৪ প্রকার এবং কন্যকা সহ ১৫ প্রকার। অবস্থাভেদে এঁরা প্রত্যেকেই ৮ প্রকার বিভেদ প্রাপ্ত হয়ে নায়িকারা হলেন ১২০ প্রকার। এঁরাই আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রীতির তারতম্যবশত উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাভেদে ৩৬০ প্রকার। একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই ৩৬০ প্রকার নায়িকা গুণ সমাহৃত হতে পারে।

যূথেশ্বরী প্রকরণে সর্বসমেত যূথেশ্বরী গণের ১২টি বিভাগ দেখানো হয়েছে।

দূতীভেদ প্রকরণে স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী-ভেদে দুই প্রকার দূতীর নির্দেশ আছে।

সখি-প্রকরণে প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্‌গুণ্যাদিবশত যূথেশ্বরীভেদ প্রকরণের মতো দ্বাদশভেদ হয়। সখিদের মধ্যে কেউ কেউ সমস্নেহা আবার কেউ কেউ অসমস্নেহা হলেও 'আমরা রাধার দাসী' --- এই অভিমান সর্বদা থাকে।

হরিবল্লভা প্রকরণে গোপীদের চতুর্ভেদ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে উদ্দীপন বিভাব প্রকরণ, অনুভাব প্রকরণ, সাত্ত্বিক প্রকরণ, ব্যভিচারি-প্রকরণ, স্থায়িভাব প্রকরণ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

স্থায়িভাব প্রকরণে দেখানো হয়েছে যে, স্থায়িভাব রতির সঙ্গে মিলিত হয়ে অপ্রাকৃত 'রস' হয়। এই রসে মধুরা রতিই স্থায়িভাব। নানা কারণে এই রতির উদয় হয়। এই কারণগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। মধুরা রতি — সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে তিন প্রকার।সমর্থা রতিই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। সাধারণী রতির প্রেম পর্যন্ত সীমা, সমঞ্জসার অনুরাগ পর্যন্ত, কিন্তু সমর্থা রতির অর্থাৎ ব্রজদেবীদের মহাভাব পর্যন্ত সীমা। আর এই মহাভাবের চূড়ান্ত রূপ শ্রীরাধাতেই কেবলমাত্র দেখা যায়।

শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে উজ্জ্বল বা মধুর রসের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উজ্জ্বল রস দ্বিবিধ— বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চার প্রকার— পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগ দুইভাবে হয়— দর্শনজাত ও শ্রবণজাত। পূর্বরাগের লালসা, উদ্বেগ আদি দশটি দশা। মানের বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারে অনুভূত হয়। প্রবাস দুই প্রকার।

মুখ্য ও গৌণ ভেদে সম্ভোগ দ্বিবিধ। মুখ্য সম্ভোগ আবার চার প্রকার। এই ১৫টি 'প্রকরণ-সমৃদ্ধ' 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মোট ১৪৫৩টি। এর তিনটি টীকা আছে। টীকাকারগণ হলেন— শ্রীজীব গোস্বামী ( ' লোচনরোচণী') শ্রীবিষ্ণুদাস ('স্বাত্মপ্রমাদিনী'), শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ('আনন্দ চন্দ্রিকা')।

বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। বিপ্রলম্ভের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতে যে রস-রূপোৎসব লাভ করেছে, শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে তারই আলঙ্কারিক বিচার বিশ্লেষণ-পূর্বক উদাহরণ-সহ বর্ণনা করেছেন।

### লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাঁর বিচিত্রধর্মী প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই গ্রন্থ। এতে তাঁর মনীষা, ভূয়োদর্শন, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং রসতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্যপ্রকরণে অসাধারণ পাণ্ডিত্যশক্তি, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। এই গ্রন্থ এবং তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানি কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে এক সার্থক সংযোজন। এই দুটি গ্রন্থে ভক্তি ও শৃঙ্গার রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিপুণ বিশ্লেষণে রসতত্ত্বে কৃষ্ণভক্তির সহজ স্বীকৃতি দিয়েছেন শ্রীরূপ। তাঁর কাছে শৃঙ্গার রসের সারভূত ভক্তিরসই একমাত্র রস। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শৃঙ্গার রসেরই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা রয়েছে। নীলমণি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে বলেই তিনি এর নাম দিয়েছেন 'উজ্জ্বলনীলমণি'। তিনি রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী মহাশক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। এই গ্রন্থদ্বয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনকে পরিপুষ্ট করেছে— পরিপূর্ণতা দিয়েছে। এক নতুন রসপ্রতীতি ও উপলব্ধির আদর্শ সৃষ্টি করেছে। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, মধুর রসে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব, নায়িকা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব ও রাধাকৃষ্ণ-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। সখী সাধনা তথা মঞ্জরী ভাবের উপাসনার রীতিও তিনি প্রবর্তন করেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। বলা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ভিত্তি তাঁরই হাতে প্রোথিত হয়েছে। যে প্রেম লৌকিক-শৃঙ্গার রসোদ্ভুত, যা পার্থিব কামনার দ্বারা কালিমাক্লিষ্ট হতে পারত, তাকে তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য ও অগাধ ভক্তিবলে এক অলৌকিক পূজার সামগ্রীতে পরিণত করেছেন— যাকে কেবল আস্বাদন করা যায় ইন্দ্রিয়ের অতীত লোকে উত্তীর্ণ হয়ে।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে কী কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

.....

.....

.....

.....

২। উজ্জ্বল বা মধুর রসের বর্ণনা দান কালে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

.....

.....

.....

.....

## ১.৩ নায়িকাভেদ প্রকরণ

শ্রীরূপ গোস্বামী বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র-সম্মত মধুর রসের অন্তর্গত নায়িকাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যাঁরা কৃষ্ণতুল্য সুরম্যাঙ্গ, সর্বসুলক্ষণাদিযুক্ত এবং মহাপ্রেম, মহামাধুরী ও বৈদগ্ধ্য ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ, যাঁরা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিতে সহায়কারী তাঁদের নায়িকা বলা হয়েছে।

বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এই নায়িকাদের প্রাথমিক পর্যায়ে— স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার পরকীয়াগণ কন্যকা ও পরোঢ়া--- এই দুই ভাগে বিভক্ত। স্বকীয়া ও পরোঢ়া নায়িকাদের তিনটি করে ভাগ---- মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা। এঁদের মধ্যে মুগ্ধার কোন ভাগ নেই। কিন্তু স্বকীয়া ও পরোঢ়ার অন্তর্গত মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকাদের প্রত্যেককে ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা-ভেদে

তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

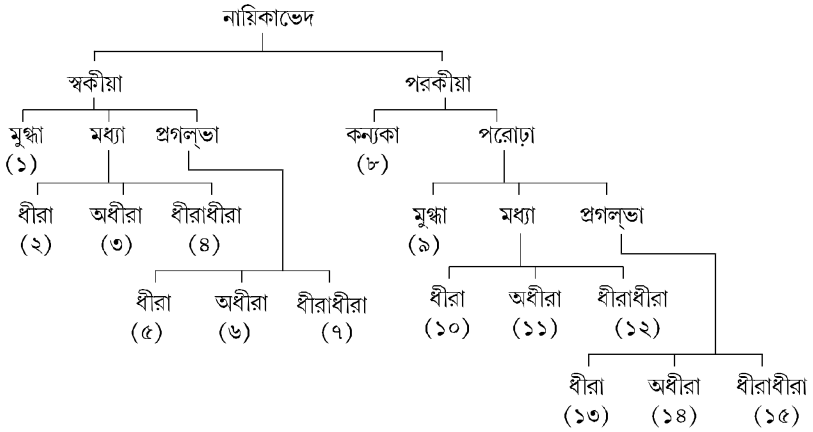


ফলে নায়িকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫।

এই ১৫ প্রকার নায়িকাদের আবার প্রত্যেককে ৮টি করে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অবস্থানহেতু ৮ ভাগে বিভাজন করায় নায়িকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে = ১২০ । 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে ---

"অথাবস্থাষ্টকং সর্ব্বনায়িকানাং নিগদ্যতে।"

এই ৮ প্রকার নায়িকারা হলেন---- অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা। এই ৮ প্রকার নায়িকাকে আবার অষ্ট নায়িকাও বলা হয়।

এই ১২০ প্রকার নায়িকাদের উত্তমা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠাভেদে তিনভাগে ভাগ করায় নায়িকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬০।

এবার মুখ্যা নায়িকাদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে---

## স্বকীয়া :

স্বকীয়া নায়িকার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বলেছেন --

"করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।

পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইব।।"

অর্থাৎ, যাঁদের বিধি অনুসারে বিবাহ করা হয়েছে, পতির আদেশ পালনে যাঁরা তৎপরা ,পাতিব্রত্য ধর্ম থেকে যাঁরা কিছুতেই বিচলিতা হন না, রসশাস্ত্রে তাঁদের স্বকীয়া নায়িকা বলা হয়েছে। দ্বারকাপুরী মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষীর সংখ্যা ১৬,১০৮ ।

এঁদের মধ্যে আবার ৮ জন প্রধানা স্বকীয়া নায়িকা হলেন --রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী। এঁদের মধ্যে আবার ঐশ্বর্যে রুক্মিণী এবং সৌভাগ্যে সত্যভামা শীর্ষস্থানীয়া।

**পরকীয়া :**

পরকীয়া নায়িকা সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে----

"রাগেনৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।

ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তিতাঃ।।"

অর্থাৎ, যে সকল নায়িকা ঐহিক ও পারত্রিক ধর্মকে গ্রাহ্য না করেই কেবলমাত্র আসক্তি বা প্রেমবশত পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করেন, অথচ যাঁদের বিবাহ ধর্মানুসারে স্বীকার করা হয়নি, রসশাস্ত্রে তাঁদের পরকীয়া নায়িকা বলে।

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আরো বলা হয়েছে যে-----

"কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধামতাঃ।"

অর্থাৎ, কন্যকা ও পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া দ্বিবিধ।

**কন্যকা :**

যাঁরা অবিবাহিতা (অনূঢ়াঃ) , সলজ্জা, পিতৃকর্তৃক পালিতা (পিতৃপালিতাঃ), সখিগণের সঙ্গে ক্রীড়া বিষয়ে নিঃশঙ্কিতা, এবং মুগ্ধা নায়িকার গুণযুক্তা (মুগ্ধা গুণান্বিতাঃ) তাঁদের কন্যা বা কন্যকা বলা হয়। ব্রজধামের ক্যাতায়ণী ব্রত-পরায়ণা কুমারীগণই হলেন কন্যকা নায়িকা।

**পরোঢ়া :**

গোপগণের বিবাহিতা হয়েও যাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগে লালসান্বিতা হয়ে থাকেন, এবং যাঁদের গর্ভে সন্তান হয় না, তাঁরাই ব্রজধামে পরোঢ়া নায়িকা নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

কন্যকার অতঃপর কোন ভেদ দেখানো হয়নি। স্বকীয়া এবং পরোঢ়া নায়িকাদের সবাইকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা-ভেদে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ-সম্পর্কে বলা হয়েছে।,---

"মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ।"

**মুগ্ধা :**

যে নায়িকার নতুন বয়স, অল্পমাত্র কাম, রতিবিষয়ে বামা, সখিদের অধীনা, রতি-চেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা অথচ গোপনে প্রযত্নশীলা, প্রিয়তমের অপরাধে সাশ্রুনয়না, প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্যে অনভ্যস্ত, মানে বিমুখ -- তাদের মুগ্ধা নায়িকা বলে। মুগ্ধার ধীরা, অধীরাদি ভেদ নেই।

**মধ্যা :**

যে নায়িকার লজ্জা ও মদন দুই সমান, যিনি প্রকাশমান যৌবনে গর্বান্বিতা, যাঁর বাক্য ঈষৎ প্রগল্‌ভ, মান বিষয়ে যিনি সময় বিশেষে মৃদু এবং অন্য সময়ে কর্কশ -- রসশাস্ত্রে তাঁকে মধ্যা নায়িকা বলা হয়েছে।

**প্রগল্‌ভা :**

যে নায়িকার পূর্ণ যৌবন, যিনি মদান্ধা, বিপরীত সম্ভোগে উৎসুকা, প্রচুরতর ভাবোদ্‌গমে পটু, প্রেমরসে প্রিয়তমকে আকৃষ্ট করায় সমর্থা, উক্তিতে এবং চেষ্টায় যিনি প্রৌঢ়া অর্থাৎ নিপুণা এবং মান বিষয়ে যিনি অতি কর্কশ তাঁকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলা হয়েছে।

**অভিসারিকা :**

অভিসারিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে--

" যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।

সা জ্যোৎস্না তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।।"

অর্থাৎ, যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন তাঁকে আভিসারিকা বলা হয়। জ্যোৎস্নী ও তামসীভেদে অভিসারিকা দ্বিবিধা। এঁরা শুক্লপক্ষে শুক্লবর্ণ বেশ এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেশভূষা ধারণ করে অভিসারে যান।

অবশ্য পরবর্তীকালে পীতাম্বর দাস তাঁর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে ৮ প্রকার অভিসারের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বাংলায় বৈষ্ণব পদকর্তারা আরো কিছু নতুন সংযোজন ঘটিয়েছেন।

**বাসকসজ্জিকা :**

'অবসর সময়ে প্রিয়তম আসবে ' --এই ভেবে যে নায়িকা নিজের দেহ এবং বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনিই বাসকসজ্জিকা। এ-সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে যে----

"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।

সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা।।"

---এঁর চেষ্টা হচ্ছে প্রিয়তমের পথ নিরীক্ষণ, সখিগণের সঙ্গে বিনোদালাপ, স্মরক্রীড়া সংকল্প এবং মুহুর্মুহু দূতীর প্রতি অবলোকন ইত্যাদি। ---

"অপরূপ রাইক চরিত।

নিভৃত নিকুঞ্জ -মাঝে ধনি সাজয়ে

পুনপুন উঠয়ে চকিত।।" (জ্ঞানদাস)

**উৎকণ্ঠিতা :**

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে ---

" অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।

বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা।।"

অর্থাৎ, নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না এলে যে নায়িকা উৎসুকা হয়ে থাকেন, ভাববেত্তা কবিগণ তাঁকে বিরহোৎকণ্ঠিতা আখ্যা দেন। এঁর চেষ্টা হচ্ছে হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, কারণের প্রতি বিতর্ক, চিন্তা, দুঃখ, অস্বাস্থ্য, অশ্রুপাত, নিজের অবস্থার বর্ণনা ইত্যাদি।

"শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া

সুখদ সংকেত-বনে।

কথিত সময় হৈল অসময়

বিলম্ব করল কেনে।।

দূতি যাও যাও তুমি যাও।" (শশিশেখর)

**বিপ্রলব্ধা :**

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে ---

"কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত বল্লভে।

ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ।।"

অর্থাৎ, সঙ্কেত করে যদি দৈবাৎ প্রিয়তম না আসেন, মনীষিগণ সেই ব্যথিতান্তরা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলেন। এঁর চেষ্টা হচ্ছে নির্বেদ(বৈরাগ্য), চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্ছা ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি। ----

"কি কাজ কুসুম সজ্জা কুমকুম চন্দন।

কি করব মণিমালা হেম আভরণ।।

কর্পূর তাম্বুল কি করব ইহাই।

যমুনার জলে সব দেই গো ভাসাই।।" (গোপালদাস)

**খণ্ডিতা :**

'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার বলেন ---

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।

ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।।"

অর্থাৎ, মিলনের কাল অতিক্রান্ত হবার পর যে নায়িকার প্রিয়তম অন্য নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগের চিহ্ন দেহে ধারণ করে সকালবেলা আসেন, তাঁকে দেখে পূর্বনায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হন। এঁর চেষ্টা ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, মৌনাবলম্বন ইত্যাদি।

" ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে।

প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে।।

.....

আই আই পড়্যাছে মুখে কাজরের শোভা।

ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনলোভা।।" (গোপালদাস)

**কলহান্তরিতা :**

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে ---

" যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।

নিরস্য-পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ।।"

অর্থাৎ, যে নায়িকা সখিদের সামনে চরণে পতিত প্রিয়তমকে নিরসন অর্থাৎ উপেক্ষা করে অথবা পরিত্যাগ করে পরে অতিশয় অনুতাপ করেন, তাঁকে কলহান্তরিতা বলে। এঁর চেষ্টা হচ্ছে প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি। কলহান্তরিতা নায়িকার উক্তি —

"আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ

সো বহু বল্লভ কান।

আদর সাধে বাদ করি তা সঞে

অহনিশি জ্বলত পরাণ।।" (গোবিন্দদাস)

কলহান্তরিতা নায়িকার প্রতি সখির উক্তি —

"কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি

অবশি বসি রোয়সি কি রাধে।

মেরু-সম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি

নাহ যব চরণ ধরি সাধে।।" (চন্দ্রশেখর)

**প্রোষিতভর্তৃকা :**

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে ---

"দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।"

অর্থাৎ, নায়ক দূরদেশে গেলে তাঁর আগমন পথ নিরীক্ষিতা নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। এঁর চেষ্টা হল প্রিয়সংকীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, নির্বেদ, চিন্তা ইত্যাদি।

মথুরাগামী শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার বিরহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে --- ভাবী-বিরহ, ভবন-বিরহ, ভূত-বিরহ।----

"কোন নিদারুণ বিধি পিয়া হরি নিল।

এ ছার পরাণ কেন অবহু রহিল।।

মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।

নিশ্চয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ।।" (গোবিন্দদাস চক্রবর্তী)

**স্বাধীনভর্তৃকা :**

স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ---

" স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।"

অর্থাৎ, দয়িত যে নায়িকার অধীন হয়ে সতত নিকটেই অবস্থান করেন, সেই নায়িকাকেই স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়। এঁর চেষ্টা হল, জলকেলি, বনবিহার, কুসুমচয়ন ইত্যাদি।------

"ধনি ধনি রমণি শিরোমণি রাই।

নয়নক ওত করত নাহি মাধব

নিশি নিশি রস অবগাই।।

করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই

অলক তিলক লিখি ভোর।

সজল বিলোকনে পুনপুন হেরই

আকুল গদগদ বোল ।।" (গোবিন্দদাস)

বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে ১২০ প্রকার নায়িকাকে উত্তমা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠাভেদে ভাগ করায় নায়িকার সংখ্যা হয়েছে ৩৬০ ।

শ্রীকৃষ্ণে যেমন নিখিল নায়কের সমস্ত অবস্থাই বিদ্যমান, তেমনি শ্রীরাধাতেও সকল নায়িকার প্রায় সমস্ত অবস্থাই রয়েছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে তাই নায়িকাভেদ প্রকরণে নায়িকা -সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়েছে --

"নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শঃ মতাঃ।"

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নায়িকাদের প্রাথমিক পর্যায়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে — স্বকীয়া এবং পরকীয়া। দ্বারকার রমণীগণ নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮ জন মহিষীর মধ্যে ঐশ্বর্যে রুক্মিণী এবং সৌভাগ্যে সত্যভামা শীর্ষস্থানীয়া। কন্যকা এবং পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া নায়িকা দ্বিবিধা। গোপগণের বিবাহিতা হয়েও যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য লালসান্বিতা, এবং যাঁদের

গর্ভে সন্তান হয় না— এ সকল ব্রজনারীকেই পরোঢ়া বলে। ধন্যা প্রভৃতি গোপকুমারীরাও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। ১৬,০০০ গোপসুন্দরীর মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠ, আবার এই দুইজনের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বাংশে উত্তমা। এঁরা পরকীয়া এবং নিত্যপ্রিয়া।

ভাগবত পুরাণে বর্ণিত মথুরার কুব্জার প্রেম সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত। কুব্জার একমাত্র ইচ্ছা কৃষ্ণের সঙ্গসুখলাভ। এই রতি অতিকায় হয় না, সেজন্য নিকৃষ্ট। এই সাধারণী রতি প্রেম পর্যন্ত উঠতে পারে। সংস্কৃত রসশাস্ত্রে সাধারণী নায়িকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'- রচয়িতাও রতিভেদে তিনটি বিভাগ দেখিয়েছেন— সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা । প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে সাধারণী (গণিকা) নায়িকাতে 'রসাভাস' হয়, কিন্তু মথুরাতে সাধারণী কুব্জাকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে শ্রীরূপ গোস্বামী সাধারণী নায়িকাকে সাধারণী হিসেবে দেখাননি। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল—

"সাম্যান্যায়াঃ রসাভাসঃ প্রসঙ্গাত্তাদৃগপ্যসৌ।

ভাব যাগাত্তু সৈরিন্ধ্রী পরকীয়ৈব সম্মতা।।"

অর্থাৎ বলা চলে যে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যদিও তিন প্রকার নায়িকার মধ্যে সাধারণী নায়িকার কথা বলেছেন, কিন্তু সাধারণী নায়িকা সম্পর্কে তাঁদের অভিমত হল, সামান্যা নায়িকাকে বেশ্যা বলে ; তার গুণহীন নায়কের প্রতি দ্বেষ অথবা গুণবান নায়কের প্রতি অনুরাগ নেই ; সে কেবল ধনমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা রাখে। এরূপ নায়িকারা শৃঙ্গারের আভাসমাত্র, এদের দ্বারা শৃঙ্গার রসের পরিপুষ্টি হয় না। কারণ, সাধারণী নায়িকার বহু নায়কনিষ্ঠ ভাব প্রযুক্ত রসাভাস প্রসঙ্গ হয়। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, সৈরিন্ধ্রী (কুব্জা) সাধারণী হলেও তার অন্য নায়কের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণঙ্গে চন্দন দান করে তাঁর প্রতি প্রীতিমতি হয় ; তাই সে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় বসন আকর্ষণ করে তাঁর কাছে রতি প্রার্থনা করেছিল, অতএব কুব্জা সামান্যা হলেও পরকীয়া রূপে সম্মতা হয়। কুব্জা সাধারণী হয়েও শ্রীকৃষ্ণে ভাবের সদ্ভাব নিবন্ধন 'কৃষ্ণবল্লভা' এবং 'পরকীয়াবৎ' বলেই সম্মত। একমাত্র কুব্জা-ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-প্রবল অন্যকোন সাধারণী নায়িকারই উল্লেখ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নেই।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. নায়িকার সর্ব অবস্থাই রাধাতে বিদ্যমান — একথা বলতে শ্রীরূপ গোস্বামী কী বুঝিয়েছেন ?

.....

.....

.....

২. বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সাধারণী নায়িকার উল্লেখ নেই কেন?

.....

.....

.....

.....

৩. অষ্টনায়িকাদের নাম লিখুন।

.....

.....

.....

.....

## ১.৪ অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) নায়িকাদের পরকীয়া ভেদ তথা শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রদত্ত পরকীয়ার সংজ্ঞা থেকে একটি প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে যে, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে উল্লিখিত পরকীয়া প্রেম অশ্লীল এবং অসামাজিক নয় কি ?

— এই অবাঞ্ছিত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে দিয়েছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে পরকীয়া প্রেমের যৌক্তিকতা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত, পার্থিব জগতে অবশ্যই নারী পুরুষের পরকীয়া প্রেম অসামাজিক এবং অশ্লীল। কিন্তু নিত্য বৃন্দাবনের নিত্যলীলায় পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে এ-প্রশ্ন অবান্তর। কেননা, এই নিত্যলীলার নায়ক হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আত্মকাম, অতএব কোন কামনাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ব্রজের এই প্রেম নারী-পুরুষের প্রেম নয়। নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা মূলত স্বয়ং কৃষ্ণই। অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া প্রেম আস্বাদনের জন্য স্বয়ং তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে বিভাজিত করে দুই হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ---

"রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একহি স্বরূপ।

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।"

অতএব, রাধা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আনন্দময় সত্তার অর্থাৎ হ্লাদিনীর ঘনীভূত নির্যাস যে মহাভাব , তারই মূর্ত বিগ্রহ।

এদিক থেকে বলা যায়, রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম আস্বাদন আসলে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাস্বাদন মাত্র।

অপরদিকে এই লীলার সহচরী গোপী যাঁরা তাঁরাও রমণী নন। কেননা, পদ্মপুরাণ অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি ঋষিরা স্বয়ং ভগবানের মাধুর্যলীলা আস্বাদনের জন্য গোপীরূপ ধারণ করে ব্রজে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। "তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপ্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে"। সুতরাং এই লীলা অশ্লীল হতে পারে না।তৃতীয়ত, শ্রীমদ্ভাগবতে এই পরকীয়া প্রেমের বক্তা হচ্ছেন ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ সন্তান আজন্ম বৈরাগী শুকদেব। পরমহংস-স্বরূপ শুকদেবের পক্ষে পশুভাবাত্মক অশ্লীল লীলার বর্ণনা সম্ভব হত না।

চতুর্থত, এই পরকীয়া লীলার যিনি শ্রোতা ছিলেন তিনি আসন্ন- মৃত্যু পথযাত্রী পরীক্ষিৎ। অবশ্যই কোন অসামাজিক লীলা শ্রবণ পরীক্ষিতের পারলৌকিক মঙ্গলের অনুকূল হত না।

পঞ্চমত, রাসলীলাকথার প্রশংসাকর্তা ছিলেন পরমভক্ত শ্রী উদ্ধব মহাশয়, যিনি গোপিগণের চরণরেণু বারবার বন্দনা করেছেন। এই লীলা অশ্লীল হলে তাঁর পক্ষে চরণরেণু বন্দনা সম্ভব হত না।

পরবর্তীকালে এই লীলার কীর্তন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং যুগাবতার পুরুষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব।

অতএব দেখা গেল যে, এই পরকীয়া প্রেম আসলে পরম পুরুষের কাছে অহৈতুকী আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই পরকীয়া লীলা অশ্লীল না হলেও এই লীলার শ্রবণ প্রাকৃত জনগণের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা। কেননা শ্রেষ্ঠগণের আচরণ দেখে ইতরজনও তাঁর আনুগত্য করবে। এর সমাধানে বলা হয়েছে ভক্তরা ভক্তবৎ আচরণ করবেন, কখনই কৃষ্ণবৎ আচরণ করবেন না---- ভক্তি শাস্ত্রের এটাই নির্দেশ। রামের মত আচরণ করবে কিন্তু রাবণের মত নয় ---- এই নীতি ধর্মকামী মুক্তিকামীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ; এর উদ্দেশ্য তাঁদের দিয়ে সদাচারাদি গ্রহণ করানো। এই নীতি ভক্তগণের আচরণীয় নয়। কেন না রুদ্র বিষপান করেছিলেন বলে ভক্তরা যদি বিষপান করেন তবে তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত। ভক্ত শুধু এই ব্রজলীলা শ্রবণ এবং আস্বাদন করবেন। ভগবান তেমন লীলাই করেন যা শ্রবণ করে ভক্তরা ভগবন্মুখী হন। কেন না বলা হয়েছে ভগবান মনুষ্যাকৃতি ধারণ করে "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ"।

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্যলীলা তার মধ্যে "কামগন্ধ নাহি"। তাই নিত্যদাস জীব এই লীলার কীর্তন ও শ্রবণেই ক্ষান্ত থাকবে। তটস্থা শক্তির অন্তর্গত জীব স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত এই লীলায় অনুপ্রবেশের ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে উল্লিখিত পরকীয়া প্রেম অসামাজিক নয় কেন, তা অতি সংক্ষেপে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

## ১.৫ 'উজ্জ্বলনীলমণি'-ধৃত অভিসার এবং বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হবার বহু পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'অভিসার'-এর উল্লেখ ছিল। অভিসারের সংজ্ঞা নির্দেশ করে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্য-দর্পণে' বলেছেন—

"অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথ বংশবদা।

স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা।।"

অর্থাৎ, যে-নায়িকা কামমত্তা হয়ে পুরুষকে আপনার নিকট আনয়ন করেন অথবা নিজেই নায়কের নিকট গমন করেন, পণ্ডিতগণ এইরূপ নায়িকাকে বলেন 'অভিসারিকা'।

বৈষ্ণব কবিগণও পদাবলিতে শ্রীরাধার অভিসারের কথা বলেছেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র-প্রণেতা শ্রীরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-প্রসঙ্গে অভিসারের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকেই অনুসরণ করে অভিসারের সংজ্ঞা প্রস্তুত করেছেন। অবশ্য তিনি অভিসারের প্রকারভেদ করে বলেছেন—

"যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।

সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেষাভিসারিকা।।

লজ্জয়া সাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।

কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখী যুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ।।"

(উজ্জ্বলনীলমণি : নায়িকাভেদ প্রকরণ)

— অর্থাৎ যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাঁকে অভিসারিকা বলে। জ্যোৎস্নী ও তামসী ভেদে অভিসারিকা দুই প্রকার। ইনি শুক্লপক্ষে অভিসারোপযোগী বেশ ও কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেশাদি ধারণ করেন। প্রিয়ের নিকট যাত্রাকালে ইনি নিজাঙ্গেই আচ্ছন্ন হন, এঁর কঙ্কণ নূপুরাদি ভূষণ নিঃশব্দ থাকে, অবগুণ্ঠনবতী হয়ে ইনি একটিমাত্র স্নিগ্ধা সখীর সঙ্গে অভিসার করেন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সব রকম অভিসারের পদ পাওয়া গেলে ও তিমিরাভিসারের পদই সেখানে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলিতেও বিচিত্র অভিসারের কথা আছে।

বাংলায় বৈষ্ণব পদকর্তারা অভিসারের পদরচনায় সর্বাবস্থায় উজ্জ্বলনীলমণিকারকে অনুসরণ করেছেন কি ---- এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এর উত্তরে বলতে হয় 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে তামসী এবং জ্যোৎস্না অভিসার ভেদে দুই প্রকার অভিসারের উল্লেখ আছে।

পদাবলিতে জ্যোৎস্নাভিসারিকার উদাহরণ —

"চান্দনি রজনী উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভস-রসে ভোরি।।
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই।।" (গোবিন্দদাস)

এবং তিমিরাভিসারিকার উদাহরণ —

"নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগমণ্ডিত
পহিরণ নীল-নিচোল।।
সুন্দরি হরি-অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরিভেল শ্যামরি
কুহু যামিনি ভয় ভাগি।।" (গোবিন্দদাস)

অবশ্য পরবর্তীকালে পীতাম্বর দাস তাঁর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে ৮ প্রকার অভিসারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ----

"সেই অভিসার হয় পুনঃ আট প্রকার।
জ্যোৎস্না তামসী বর্ষা দিবা অভিসার।।
তীর্থযাত্রা কুজ্ঝটিকা উন্মত্তা সঞ্চারা।
গীত-পদ্য-রসশাস্ত্রে সর্বজনোৎকরা।।"

বৈষ্ণব পদাবলিতে এই অষ্ট প্রকার অভিসারের মধ্যে তিমিরাভিসার এবং জ্যোৎস্নাভিসার ছাড়াও অন্যান্য ছয় প্রকার অভিসারের উদাহরণের অভাব নেই। যেমন—

**বর্ষাভিসার :**

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।।
.....
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।" (রায়শেখর)

**দিবাভিসার :**

"মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কএল অভিসার।।
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।" (গোবিন্দদাস)

**তীর্থযাত্রা-অভিসার** :

পুণ্য অর্জনের জন্য মাঘ স্নানের ছলে রাধিকার যে হরি-অভিসার তা তীর্থযাত্রা অভিসারের মধ্যেই গণ্য।

"চলু বরনাগরী সঙ্গম মাহ।
সচকিত নয়নে দশদিক চাহ।।
ঐছন সময়ে নিবিড় বনমাঝ।
মীলল একলে নাগর রাজ।।" (কবিশেখর)

**কুজ্ঝটিকা অভিসার** :

" মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ।।
এ সহি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই।।"

**উন্মত্তাভিসার** :

"রাই সাজে, বাঁশি বাজে, পরি গেল উল।
কি করিতে কি-না করে, সব হৈল ভুল।।
মুকুরে আঁচড়ি রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার।।" (বংশীবদন)

**সঞ্চরাভিসার** :

সঞ্চরা শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "অসমঞ্জস্যাভিসারিকা" অর্থাৎ "ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা" অর্থাৎ শিথিল বস্ত্র এবং আভরণ পরিধান করে যে অভিসার তাকে সঞ্চরা অভিসার বলা হয়েছে। যেমন --

"শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ।
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ।।
খসত-বসন রসন খোলি
বিগলিত বেণী লোলণি।" (গোবিন্দদাস)

এছাড়াও বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তারা আরো কিছু নতুন সংযোজন ঘটিয়েছেন। যেমন—হিমাভিসার, ছদ্মবেশে অভিসার ইত্যাদি।

**হিমাভিসার** :

"ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই।।
কমলচরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক-বাটে কতিহুঁ নাহি টলই।।" (গোবিন্দদাস)

**ছদ্মবেশে অভিসার** :

"পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার।।
ধম্মিল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ।।
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু ভেল।
বাজন-যন্ত্র হৃদয় করি লেল।।" (বিদ্যাপতি)

এছাড়াও অন্যান্য কিছু অভিসারের পদ বৈষ্ণব পদাবলিতে আমরা পাই। যেমন -- কুসুম-চয়ন-ছলে অভিসার ইত্যাদি। তাই আমরা বলতে পারি যে,বৈষ্ণব পদকর্তারা অভিসার পর্যায়ে 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কারকে অনুসরণ করেছেন এবং তার পরেও এতে বৈচিত্র্য এনেছেন নতুন সংযোজনের মাধ্যমে।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. 'উজ্জ্বলনীমণি' গ্রন্থে কয়প্রকার অভিসারের উল্লেখ আছে?

.....

.....

.....

.....

২. অভিসার পর্যায়ে বৈষ্ণব পদকর্তারা 'উজ্জ্বলনীলমণি' কারের নির্দেশ কতটুকু অনুসরণ করেছেন এবং কতটুকু স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, অতি সংক্ষেপে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

## ১.৬. আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম, বৈষ্ণব ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে 'নায়িকাভেদ-প্রকরণ'-এ নায়িকাদের নিখুঁত এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন।

নায়িকাভেদ প্রকরণে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী গোপিগণের পরোঢ়াত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়েছে। এখানে শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, স্বকীয়া, পরকীয়া ভেদে নায়িকা মোট ১৪ প্রকার এবং কন্যকা সহ ১৫ প্রকার। অর্থাৎ নায়িকা স্বকীয়া, পরকীয়া ও কন্যকা। কন্যকার মুগ্ধা ছাড়া অন্য কোন ভেদ নেই, অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন, কন্যকা সর্বদাই মুগ্ধা, তাঁর অবস্থান্তর হয় না। স্বকীয়া এবং পরকীয়া নায়িকাদের মধ্যে মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা এই তিন ভেদ। মুগ্ধার কোন ভেদ নেই ; কিন্তু মধ্যা ও প্রগল্‌ভার ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা ভেদ আছে। অবস্থাভেদে এই ১৫ প্রকার নায়িকা আবার ৮ প্রকার বিভেদপ্রাপ্ত হন। এঁরা হলেন— অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা। এঁদের বলা হয় 'অষ্টনায়িকা'। অর্থাৎ, নায়িকার সংখ্যা হল ১২০। এঁরাই আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রীতির তারতম্যবশত উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাভেদে ৩৬০ প্রকার।একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই ৩৬০ প্রকার নায়িকা গুণ যে সমাহৃত হতে পারে তা শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অন্যত্র দেখিয়েছেন।

'নায়িকাভেদ প্রকরণ' আলোচনাকালে আমরা অতিরিক্ত জানতে পেরেছি যে, পরকীয়া প্রেম পার্থিব জগতে নিশ্চিতভাবে অসামাজিক এবং অশ্লীল হলেও নিত্য বৃন্দাবনের নিত্যলীলায় পরকীয়া প্রেমে এই অসামাজিকতা এবং অশ্লীলতা নেই। কারণ, এই নিত্যলীলার নায়ক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আত্মকাম। আর নায়িকা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের হলাদিনী শক্তির ঘনীভূত নির্যাসরূপ মহাভাবের মূর্ত বিগ্রহ। তাই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পরকীয়া প্রেম অশ্লীল এবং অসামাজিক নয়।

এছাড়া ও আমরা অতিরিক্ত জানতে পেরেছি বাংলায় বৈষ্ণব পদকর্তারা অভিসারের পদরচনায় 'উজ্জ্বলনীমণি'-র রচয়িতাকে অনুসরণ করেও অভিসার পর্যায়ের বৈচিত্র্যে তাঁকে ছাড়িয়ে কীভাবে অভিসারের বিস্তৃতি এনেছেন।

আমরা আরো জেনেছি যে, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সাধারণী রতির উল্লেখ থাকলেও সাধারণী নায়িকাকে কেন স্বীকার করা হয়নি।

অতএব, আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা নায়িকাভেদের বিস্তারিত আলোচনা পেলাম।

## ১.৭. প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

দ্বিতীয় বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

## ১.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

দ্বিতীয় বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

## ১.৯. প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

দ্বিতীয় বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

# বিভাগ-২
# উজ্জ্বলনীমণি
## উজ্জ্বলনীমণি : শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ

**বিষয়বিন্যাস**


২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ শৃঙ্গারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

২.৩ পূর্বরাগ : সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

২.৩.১ প্রৌঢ় পূর্বরাগ : দশটি দশা

২.৪ অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

২.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ২.০ ভূমিকা (Introduction)

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা নয়টি রসকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভক্তিকে কেউই রসরূপে স্বীকার করেননি। ভরতের নাট্যসূত্রে নাট্যরস ও কাব্যরস বলে আখ্যাত রসের মধ্যে ভক্তিরসের উল্লেখ নেই। মম্মট ভট্ট দেবাদিবিষয়া রতিকে ভাবের মধ্যে ফেলেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভগবদ্-বিষয়ক রতিকে তথা ভক্তিকেই মুখ্যরসরূপে গ্রহণ করেছেন, এবং সর্বপ্রথম এই ভক্তিকে রস বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, ভক্তিরসের সঙ্গে তাঁরা অন্যান্য সকল রসের স্বরূপত পার্থক্য দেখিয়ে ভক্তিকে সর্বোচ্চ এবং প্রকারান্তরে একমাত্র রসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যে নবরসকে কাব্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার মধ্যে শৃঙ্গার রস হল আদিরস এবং প্রধান রস। কারণ শৃঙ্গার রস সর্বসাধারণ-গ্রাহ্য বলেই প্রধান, এবং প্রধান বলেই প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যে শৃঙ্গাররসের কথা বলেছেন, তা প্রাকৃত।

অপরপক্ষে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা ও শৃঙ্গারকে প্রধান রস বলেছেন, কিন্তু সে প্রাধান্য ব্যাপ্তির দিক দিয়ে নয়, গভীরতার দিক দিয়ে। এই শৃঙ্গার অপ্রাকৃত দেবাদিবিষয়া রতি অর্থাৎ কৃষ্ণরতি-জাত। যে ভক্তিরসকে বৈষ্ণবাচার্যেরা প্রতিষ্ঠা করলেন, গাঢ়তা অনুযায়ী তা পঞ্চবিধা— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এর প্রত্যেকটিই উত্তরোত্তর মহত্তর। মধুর প্রেমে আছে সর্বরাগরসায়ন। এইজন্য সর্বরসের শেষে শৃঙ্গার বা মধুর রসের

উল্লেখ ; বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার আদিরস নয়, অন্ত্যরস। সর্বরসের আস্বাদ এসে শৃঙ্গারে মিলিত হয়েছে, 'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়'— তাই শৃঙ্গার সবচেয়ে গভীর। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে এই শৃঙ্গার পঞ্চম রাগ-রসায়ন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামীএই শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যানুসারেই আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা করব।

## ২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম রসশাস্ত্রকার শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর দুটি গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অতল-অপার মহাসাগর-সদৃশ ভক্তিরস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভক্তিরসের উজ্জ্বলতম রস হল মধুর বা শৃঙ্গাররস। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন, সেই অতলান্ত ভক্তিরস-রূপ মহাসাগর-মন্থিত নীলমণি রত্ন-স্বরূপ হল এই উজ্জ্বল বা মধুর বা শৃঙ্গাররস। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এই মধুররসের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী।

বৈষ্ণব আচার্যগণ ভগবদ্‌বিষয়ক রতিকে তথা ভক্তিকেই মুখ্যরসরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ভগবদ্‌প্রীতিকেই একমাত্র স্থায়ীভাব এবং ভক্তিকে তথা মধুরা রতিকেই মুখ্যরস বলে প্রতিপাদন করেছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা যখন পরমানন্দের উৎকর্ষ-সাধন করায় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় মমতা প্রদান করে, তাকেই বলে প্রেমভক্তি। বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রে পঞ্চপ্রেমভক্তিরসের মধ্যে গুণে-মাধুর্যে-উৎকর্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার রস, যাকে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন 'ভক্তিরসরাট্'। আলোচ্য অধ্যায়ে আপনারা 'শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে' এই শৃঙ্গার বা মধুর বা ভক্তিরসের বিস্তৃত আলোচনা পাবেন। এখানে আমরা 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ-অবলম্বনে আলোচনা করব 'শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ'। যেহেতু এই প্রকরণের কেবলমাত্র 'পূর্বরাগ' পর্যায়টি আপনাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে, তাই এই পর্যায়টির আলোচনাই মুখ্যত এখানে স্থান পেয়েছে। এই আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

* শৃঙ্গার বা মধুর রস কী।
* শৃঙ্গার রস কতপ্রকার ও কী কী।
* আপনাদের পাঠ্যতালিকায় নির্দিষ্ট পর্যায় 'পূর্বরাগ' সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন, এবং প্রসঙ্গত জানবেন—
* পূর্বরাগ কতপ্রকার ও কী কী।
* পূর্বরাগ কতভাবে জাত হতে পারে
* প্রৌঢ়া পূর্বরাগ কী।
* পূর্বরাগের দশ দশা কী কী।

এই আলোচনা অবশ্যই বৈষ্ণব পদাবলি থেকে উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপিত করা হবে।

## ২.২. শৃঙ্গারের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা ও মাধুর্যলীলার মধ্যে মাধুর্যলীলাই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং মধুর ভক্তি রসই শ্রেষ্ঠ 'ভক্তিরসরাট্'। মধুর ভক্তিরসের এই গুরুত্বের জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এর আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শৃঙ্গার রসের আদর্শেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মধুর বা শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। লৌকিক অলঙ্কার শাস্ত্রের আদি-রসকেই তিনি অপ্রাকৃত পটভূমিকায় স্থাপন করে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রকে এক নতুন ব্যঞ্জনায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু ---

"এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।

কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে।।"

ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় এই শৃঙ্গার ভক্তিরসেরই প্রাধান্য। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রেমভক্তিতত্ত্ব আলোচনাকালে শৃঙ্গার-রসকে এবং রাধাপ্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মর্যাদা দিয়েছেন।

শ্রীভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে স্বরূপশক্তি সর্বপ্রধান। এই স্বরূপশক্তি ত্রি-রূপা — সদংশে সন্ধিনী, চিদ্‌অংশে সংবিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। হ্লাদ স্বরূপ স্বয়ং শ্রীভগবান হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আহ্লাদিত হন। এই হ্লাদ অংশেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমলীলা। ভগবানের স্বরূপভূত এই দিব্য প্রেমই বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস।

এই মধুর বা শৃঙ্গার রস প্রধানত দুই প্রকার — বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন —

"যুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।

অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।

স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ।।"

অর্থাৎ, নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদি অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হয়, তাকেই 'বিপ্রলম্ভ' বলা হয়। এটি কিন্তু সম্ভোগেরই উন্নতিকারক।

বিপ্রলম্ভ ছাড়া সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না। —

" ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।"

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার চারপ্রকার — পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, ও প্রবাস। —

"পূর্ব্বরাগস্তথামানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।

প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ ।"

আমাদের পাঠ্যক্রমে শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে যেহেতু 'পূর্বরাগ' পর্যায়কেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাই এখানে এই 'পূর্বরাগ' পর্যায় সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তি রসকে প্রতিষ্ঠা করে এর পাঁচটি বিভাগ দেখিয়েছেন— শান্ত, দাস্য, সখ্য,বাৎসল্য এবং মধুর। গাঢ়ত্বের ক্রমবৃদ্ধিক্রমে মধুর রসকেই এঁরা শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দিয়েছেন। লৌকিক শৃঙ্গার রসকে এঁরা অলৌকিক পর্যায়ে উন্নীত করে এর নাম দিয়েছেন 'উজ্জ্বল'বা 'মধুর' রস। মধুর ভক্তিরসের আলম্বন বিভাব— কৃষ্ণ ও কান্তাগণ ; উদ্দীপণ বিভাব— গুণ, চেষ্টা, বংশীআদি ; অনুভাব নৃত্য, গীত, অশ্রু আদি ; ব্যভিচারী ভাব— বিষাদ, দৈন্য ইত্যাদি। এই সকলের সম্মিলনে মধুরা রতি নামে স্থায়ীভাবের রসনিষ্পত্তি ঘটে।

দ্বিবিধা মধুর রস সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মধ্যে কেবলমাত্র 'পূর্বরাগ' আপনাদের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করা হয়েছে তাই 'পূর্বরাগ' সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অপরাপর বিভাগগুলি টীকাকারে পরে আলোচিত হয়েছে।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. লৌকিক শৃঙ্গাররসকে শ্রীরূপ গোস্বামী কীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন লিখুন।

.....

.....

.....

.....

২. শৃঙ্গার বা মধুর রস কতপ্রকার ও কী কী? বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার কাকে বলে?

.....

.....

.....

.....

## ২.৩ পূর্বরাগ : সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

প্রেমের প্রথম সঞ্চার পূর্বরাগে। ইংরেজিতে বলা হয়েছে Love at first sight; মনীষী হরেন্দ্রনাথ একে বলেছেন First Flame of love। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রেও প্রায় অনুরূপভাবেই পূর্বরাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণে' বলেছেন—

"শ্রবণাদ্‌দর্শনাদ্বাপিমিথঃ সংরূঢ় রাগয়োঃ।

দশাবিশেষো যোহপ্রাপ্ত পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।"

অর্থাৎ , গুণ শ্রবণ ও রূপদর্শনহেতু পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার মিলন না হলে যে অবস্থা বিশেষ হয়, তাকেই 'পূর্বরাগ' বলে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকার শ্রীরূপ গোস্বামীও পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একথাই বলেছেন।

পূর্বরাগ সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে যে, —

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।"

অর্থাৎ, যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে পণ্ডিতগণ তাকেই পূর্বরাগ বলেন। এখানে দেখা গেল পূর্বরাগ দুভাবে জাত হয় : দর্শন এবং শ্রবণ থেকে।

একটি রৈখিক চিত্রের দ্বারা শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ অবলম্বনে পূর্বরাগের স্বরূপ দেখানো হল—

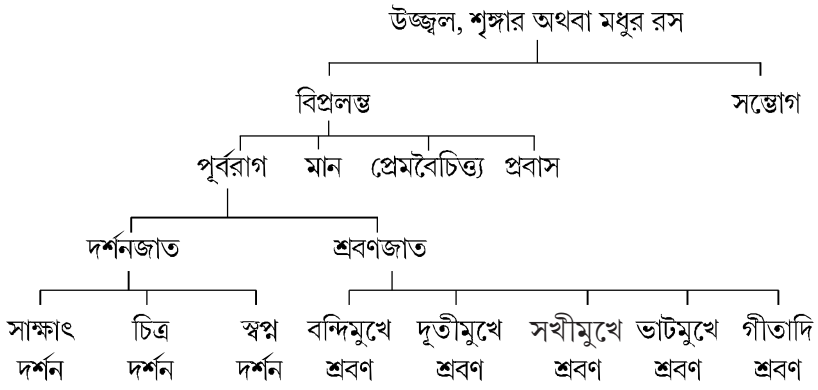


এবার আমরা দর্শন ও শ্রবণজাত পূর্বরাগের ভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করব। দর্শনজাত পূর্বরাগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ---

" সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনং।।"

অর্থাৎ দর্শনজাত পূর্বরাগ হল সাক্ষাৎ , চিত্রে এবং স্বপ্নে কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার।

**সাক্ষাৎদর্শন** :

শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ মাধুর্য রাধিকার কোন না-কোনভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেই দর্শনজনিত রাগের প্রকাশ ঘটেছে রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে। যেমন—

"সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।

ব্রজকূল নন্দন, হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে।।" (বড়ু চণ্ডীদাস)

**চিত্রে দর্শন :**

কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার ব্যাকুলতা লক্ষ করে বিশাখা শ্যামের চিত্র অঙ্কন করে নিয়ে এসেছেন। অতঃপর --

"এমন মূরতি কেমন করি।
লিখিলে বিশাখা ধৈরয ধরি।।
দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন রূপ কি জগতে আছে।।"

**স্বপ্নে দর্শন :**

স্বপ্নে দর্শন বিভিন্নভাবে হয়। নায়ক-নায়িকার ঘুমঘোরে স্বপ্নদর্শন ছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালের দিবা-স্বপ্নের মতোও গভীর ভাবনা স্বপ্নবৎ চিত্তপটে ভেসে ওঠে। রাধার ঘুমঘোরে স্বপ্নে কৃষ্ণ-দর্শনের উদাহরণ ---

"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনা আর কারু নই।।" (জ্ঞানদাস)

রাধার মানসলোকে (দিবাস্বপ্ন) কৃষ্ণ-দর্শন ---

"কি খেনে হইল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বঁধু মনে পড়ে শয়নে স্বপনে।।" (নরোত্তমদাস)

**শ্রবণজাত পূর্বরাগ :**

শ্রবণজাত পূর্বরাগের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে —

"বন্দী-দূতি-সখী-বক্তাদ্‌গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ।।" — অর্থাৎ, বন্দী, দূতী, সখী প্রভৃতির মুখে এবং গীতাদি শ্রবণ থেকে এই পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। যেমন —

"নামে মুরলী রবে গুণীগানে স্বপনে হুঁ } ( নাম,মুরলী এবং গুণীজন মুখে শ্রবণ;
চিত্রে দরশে প্রতি আশ। } স্বপ্নে ও চিত্রে দর্শন।)

কাতর অন্তরে সখী মুখ চাহি ধনি
কহত হি গদগদ ভাষ।।
সখী হে কি কহব কহন না যায়।

**নাম শ্রবণজাত—** অপরূপ শ্যাম নাম দুই আখর
তিলে তিলে আরতি বাড়ায়।।

গীতাদি বা বংশীধ্বনি শ্রবণজাত) — মুনিমনোমোহন মুরলী-খুরলি শুনি
ধৈরজ ধরণ না যাতি।

গুণীজন মুখে শ্রবণ — মনোরম গুণগণ গুণীজন গানে শুনি
চীত রহল তঁহি মাতি।।

বন্দী এবং দূতী মুখে শ্রবণ — বিদগধ সুন্দর কহত দূতী মোহে
ভট্ট কীরিতি যশ গায়।
শুনি শুনি উনমত চীতে ভেল মনমথ
এ চপল জীবন দোলায়।।" (জ্ঞানদাস)

বৈষ্ণব পদকর্তারা বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য সর্বাবস্থায় শ্রীরূপ গোস্বামীকে অনুসরণ না করে নাম শ্রবণজাত পূর্বরাগ ও গুণিজনমুখে শ্রবণজাত পূর্বরাগের কথা বলেছেন। যেমন ---

নাম শ্রবণজাত পূর্বরাগ --

"পহিলে শুনিলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি গেল।।" (গোবিন্দদাস)

**গুণিজনমুখে শ্রবণজাত পূর্বরাগ :**

" আর একদিন মোর প্রাণসখী
কহিলে যাহার নাম।
গুণীগণ গানে শুনিলুঁ শ্রবণে
তাহার এ গুণগান।।" (উদ্ধব দাস)

অর্থাৎ, 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নির্দেশ ছাড়াও পূর্বরাগের পদ রচনায় বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তারা আরো কিছু নতুন বিষয় যোগ করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সমর্থা নায়িকার সমর্থা রতিজাত পূর্বরাগের পদ। কৃষ্ণ বিষয়ক ধ্বনি মাত্র শ্রবণে রাধার পূর্বরাগ দেখাতে গিয়ে পদকর্তারা কৃষ্ণের নাম শ্রবণজাত পদ রচনা করেছিলেন। যেমন--

"সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।" (চণ্ডীদাস)

এবং দ্বিতীয়ত পদকর্তারা আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, তা হল গুণীজনের মুখে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণজনিত পূর্বরাগের পদ।

রতিভেদে পূর্বরাগকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে — (১) সাধারণী

(২) সমঞ্জসা, (৩) সমর্থা

সাধারণী রতিতে জাত পূর্বরাগকে বলা হয় সাধারণী পূর্বরাগ। সাধারণ রতির অর্থ হল, যে রতি গাঢ় নয়। কৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁর রূপলাবণ্যে বিহ্বল হয়ে সম্ভোগকামনায় এই রতির জন্ম। এই রতির মূলে থাকে ইন্দ্রিয়পিপাসা চরিতার্থের বাসনা। এই 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'কে রতি বলা হয় এজন্যই যে, এতে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা' অতি সামান্য হলেও বর্তমান থাকে। কুব্জার পূর্বরাগ এই স্তরের।

সমঞ্জসা পূর্বরাগ হল— কৃষ্ণের রূপ গুণের কথা শ্রবণ করে যেখানে সম্ভোগেচ্ছা জন্মে এবং শাস্ত্রমতে বিবাহের দ্বারা যেখানে সম্ভোগেচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। সত্যভামা ও রুক্মিণীর কৃষ্ণ বিষয়ক রতি সমঞ্জসা। এঁরা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী। সমঞ্জসা রতিতে—পূর্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ক্রমশ উৎপন্ন হয়। সমঞ্জসা নায়িকার অভিসারাদি নেই।

সমর্থা বা প্রৌঢ় পূর্বরাগ এই দুই প্রকার থেকে অনেক উচ্চস্তরের। সমর্থা রতিতে জাত পূর্বরাগকে বলা হয় সমর্থ বা প্রৌঢ় পূর্বরাগ। সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রতি স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্যা। কৃষ্ণের প্রীতি-ইচ্ছা পূরণের অভিলাষেই এর উন্মীলন। লোকধর্ম, দেহধর্ম, বেদধর্ম— সবকিছুই এতে তুচ্ছ মনে হয়। কৃষ্ণসুখই এর একমাত্র লক্ষ। ব্রজগোপীদের রতি সমর্থা। বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্রে সমর্থা রতিই শ্রেষ্ঠা।

ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার নায়িকা-শিরোমণি মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধাতেই সমস্ত ভাবের পর্যবসান। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণের জন্যই কৃষ্ণকে ভালবাসা—সর্বধর্ম পরিত্যাগকরে একমাত্র তাঁর শরণ নেওয়া— এই সমর্থা বা প্রৌঢ়া রতিরই লক্ষণ। এই রতিই রাগাত্মিকা। কৃষ্ণানুধ্যানের প্রগাঢ় তন্ময়তায় সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হয়। আত্মবিস্মৃতি ঘটে। এই প্রৌঢ় পূর্বরাগে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু অর্থাৎ মূর্ছা— এই দশ দশা দেখা যায়। আমরা পরবর্তীতে এই দশ দশার আলোচনা পৃথকভাবে করব।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

দ্বিবিধ মধুর বা শৃঙ্গার রস-ভেদের মধ্যে 'পূর্বরাগ' 'বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের' প্রথম পর্যায়। মিলনের পূর্বে রূপ দর্শনে বা রূপ গুণাদির কথা শ্রবণে নায়ক বা নায়িকার মনে যে রতির উদ্‌গম হয়, তার ফলে মিলনের বাসনা জাগে। কিন্তু তৃষ্ণা পরিপূরিত না হওয়ায় বিপ্রলম্ভের উদ্ভব। এই বিপ্রলম্ভকালে নায়ক বা নায়িকার অনন্যমনা চিন্তার ফলে স্ফূর্তিতে বিষয়ালম্বনের আবির্ভাব হয় এবং তখন মানস, চাক্ষুসাদি সম্ভোগ হয়। এভাবেই পূর্বরাগ রতি আস্বাদ্য রূপে রসতা প্রাপ্ত হয়। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার পূর্বরাগের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার অনুসরণে 'রসকল্পবল্লী'তে উল্লিখিত পূর্বরাগের লক্ষণটি উল্লেখ করা যায়—

"সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ"।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণব মহাজনেরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবাকেই 'ভক্তি'

নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাকর্তারা পূর্বরাগ পর্যায়ে শ্রীরাধার পূর্বরাগের বর্ণনা করতে গিয়ে রাধিকারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণ-উন্মুখ করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা রচনা করেছিলেন। যেমন —

চক্ষু —

"নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।"

কর্ণ —

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

নাসিকা —

"তবু তো দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।"

জিহ্বা —

"এ ছার রসনা মোর কি হইল বামরে।
যার নাম না লইব লয় তার নামরে।।"

ত্বক —

"দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।"

সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা— এই ত্রিবিধা পূর্বরাগের মধ্যে গুণগতভাবে সমর্থা বা প্রৌঢ় পূর্বরাগই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন শ্রীরূপ গোস্বামী। সমর্থা বা প্রৌঢ় পূর্বরাগে যে দশটি দশার কথা আমরা পাই তার ভেতর দিয়ে প্রেমাঙ্কুরের মহীরুহরূপ ধারণের অতি প্রত্যক্ষ-আভাস পাওয়া যায়।

মধুর রসের পদাবলিতে পূর্বরাগ প্রেমাভিব্যক্তির তথা রস পর্যায়ের সূচনা স্তর।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. পূর্বরাগ কাকে বলে? 'উজ্জ্বলনীলমণি'র শ্লোক অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২. পূর্বরাগ কতপ্রকার ও কী কী?

.....

.....

.....

.....

৩. বৈষ্ণব পদকর্তারা 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কে অবলম্বন করে পূর্বরাগ পর্যায়ে আরো কী কী সংযোজন ঘটিয়েছেন পদাবলি সাহিত্যে, তা উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

.....

**২.৩.১. প্রৌঢ় পূর্বরাগ : দশটি দশা**

সঙ্গমের পূর্বে সমর্থা রতিতে জাত পূর্বরাগই প্রৌঢ় পূর্বরাগ নামে অভিহিত হয়। এই পূর্বরাগে লালসা থেকে শুরু করে মরণান্ত দশা পর্যন্ত পূর্বরাগের দশটি দশাই হতে পারে।

প্রৌঢ় পূর্বরাগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে --

"সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।"

প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশটি দশা হল ---

"লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবংজড়িমাত্রতু।

বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদৈর্মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।।"

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

পূর্বরাগের প্রৌঢ়তাবশত এই দশাগুলি প্রৌঢ়ই হয়। প্রৌঢ়া রতি অনুসারে পূর্বরাগের দশটি দশা। যেমন —

**লালসা :**

লালসার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে - "অভীষ্ট-লিপ্সয়া গাঢ় গৃধ্নুতা" অর্থাৎ অভীষ্টজনের প্রাপ্তির জন্য যে প্রগাঢ় তৃষ্ণাশীলতা তাকেই লালসা বলা হয়। এর চেষ্টা হল ঔৎসুক্য, চপলতা এবং ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি । যেমন —

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।" (দ্বিজ চণ্ডীদাস)

**উদ্বেগ :**

"উদ্বেগো মনসঃ " -- অর্থাৎ মনের চঞ্চলতাকেই উদ্বেগ বলা হয়েছে। এতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, চাপল্য, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, স্বেদ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। যেমন --

"সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়া পড়ে।।" (দ্বিজ চণ্ডীদাস)

**জাগর্যা :**

"নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা" -- অর্থাৎ নিদ্রার অভাবকেই জাগর্যা বলে। এর সঞ্চারী ভাব হচ্ছে স্তম্ভ, স্বেদ, ব্যাধি ইত্যাদি। যেমন—

"না রুচে ভোজন পান তেজিলুঁ শয়নে।
বিষ মিশাইল যেন এ ঘর করণে ।।" (চণ্ডীদাস)

অথবা --

" শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে।।" (চণ্ডীদাস)

**তানব :**

"তানবং কৃশতা গাত্রে" — অর্থাৎ দেহের কৃশতাকেই তানব বলা হয়। এতে দৌর্বল্য ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়। যেমন —

"জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ।
অসিত চাঁদের উদয় দিন।।" (জ্ঞানদাস)

অবশ্য 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে —

"কৈশ্চিত্তু তানবস্থানে বিলাপঃ পরিপাঠ্যতে"—

অর্থাৎ কোন কোন কবি 'তানব' স্থলে 'বিলাপ' পাঠ করেন।

**বিলাপ :**

"আলো মুই কেন গেলুঁ যমুনার জলে।
চিত মোর হরি নিল ছলিয়া নাগর ছলে।।" (জ্ঞানদাস)

**জড়িমা :**

যে অবস্থায় হিত ও অহিত বিষয়ের সম্যক জ্ঞান থাকে না, যাতে সখিদের প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায় না এবং দৃষ্ট বস্তু অদৃষ্টবৎ, শ্রুত কথা অশ্রুতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাকে জড়িমা বলে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলা হয়েছে --

"ইষ্টানিষ্টা পরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরং।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোহভিধীয়তে।।"

এতে অকস্মাৎ হুংকার, স্তম্ভ, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, ভ্রম ইত্যাদি প্রকটিত হয়। যেমন —

"শুনইতে কাহাহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকশই
কহইতে সজল নয়ান।।
সখি হে কী ভেল এ বরনারী।।" (বলরামদাস)

**বৈয়গ্র্য :**

ভাববিকার সমূহের বাহ্যিক অপ্রকাশজনিত যে গাম্ভীর্য এবং এর ফলে বিক্ষোভের যে অসহিষ্ণুতা তাকে বৈয়গ্র্য বলে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আছে --

"বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।
অত্রাবিবেকনির্ব্বেদখেদাসূয়াদয়োমতাঃ।।"

এতে অবিচার, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া ইত্যাদি প্রকাশ পায়। যেমন--

**খেদ :**

"সে মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে।।" (বলরামদাস)

**ব্যাধি :**

"অভীষ্টলাভতো ব্যাধিঃ পণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ"।

— অর্থাৎ, যাতে অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত কারণে শরীরে শ্বেততা ও

মহাতাপরূপ চিহ্ন প্রকাশ পায় তাকে ব্যাধি বলে। এতে শীত, স্পৃহা, মোহ, দীর্ঘনিশ্বাস, পতন ইত্যাদি অনুভাব প্রকাশ পায়। যেমন —

"অকথন বেয়াধি সই কহনে না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।।
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গলি যায়।
সোনার পুতলি যেন ধুলায় লুটায়।।" (চণ্ডীদাস)

**উন্মাদ :**

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তদতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ।।"

অর্থাৎ, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য ইত্যাদি ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সর্বাবস্থায়, সর্বদা ও সর্বত্র তন্মনস্কতাহেতু যে বস্তু যা নয় তাকে তাই বলে মনে করায় যে ভ্রান্তি তাকে উন্মাদ বলা হয়। এতে দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ বিরহ ইত্যাদি অনুভাব প্রকাশ পায়। যেমন —

" ওঝা রোজা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বৃষভানু সূতা।।" (চণ্ডীদাস)

**মোহ :**

"মোহে বিচিত্ততা প্রোক্তো নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ"।

অর্থাৎ চেতনারহিত অবস্থাকেই মোহ বলা হয়েছে। এতে নিশ্চলতা ও পতনাদি ঘটে থাকে। যেমন —

"পাণ্ডুর বরণ ব্যায়ধি বাধা।
মূরছি নিঃশ্বাস হরল রাধা।।" (জ্ঞানদাস)

**মৃত্যু :**

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ ।।"

অর্থাৎ, কামলেখ প্রেরণ, সখীদের দ্বারা নিজের অবস্থার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রতিকার সমূহ অবলম্বনের পরও যদি প্রিয়তম না আসেন তবে নিদারুণ বিরহ হেতু নায়িকার যে অবস্থায় মরণের উদ্যম হয়ে থাকে তাকে মৃতি বা মুত্যু বলা হয়। যেমন—

"মরিব মরিব সই নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব।।
তোমরা যতেক সই থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে হরি নাম লিখ মঝু অঙ্গে।।"

অথবা —

"না পোড়াইয়ো রাধা অঙ্গ না ভাসাইয়ো জলে।

মরিলে তুলিয়া রেখ তমালেরি ডালে।।"

আসলে মৃত্যু পরম প্রেম বা শৃঙ্গার রসের প্রতিকূল। তাই রসশাস্ত্রকারেরা পূর্বরাগের দশম দশায় মৃতি বা মৃত্যু বলতে জীবনের অন্তিম দশাকেই নির্দেশ করেছেন। জীবনের ইতি বা সমাপ্তিকে বোঝাননি। তাই 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে মৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে 'মরণোদ্যমঃ' — এই বিশেষ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই মৃতিতে বয়স্যাদের নিকট নিজের প্রিয়বস্তুর সমর্পণ এবং মধুকর, মন্দপবন, জ্যোৎস্না, কদম্ব, ময়ূর, কোকিল ইত্যাদি বহু উদ্দীপন বিভাবের প্রকাশ ঘটে বা প্রকটিত হয়। যেমন -- শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীর বাচনিক রাধার অন্তিম দশার উদাহরণ দিয়েছেন বিদ্যাপতি --

"অরুণ নয়নলোরে এ তিল কলেবর

বিলুলিত দীঘল কেসা।

মন্দির বাহির করইতে সংসয়

সহচরি গণতহি সেসা।।

মাধব কত পর বোধব রাধা।

হা হরি হা হরি কহতহি থোরি থোরি

অব হিউ করব সমাধা।।"

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ রসের শৃঙ্গার। মিলনের পূর্বে অথবা পরে পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার অপ্রাপ্তিজনিত ভাবকেই বলা হয় বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বরাগ-সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন যে — যদিও মাধবের রাগই প্রথমে সমুৎপন্ন হয়, তথাপি ব্রজদেবীগণের প্রথম রাগেই চারুতার আধিক্য দেখা যায়।

ব্রজদেবীগণের ললনানিষ্ঠ রতিতে দেখা-শোনার অপেক্ষা থাকে না। রূপ না দেখে, গুণের কথা না শুনেও শ্রীকৃষ্ণে রতি তাঁদের স্বয়ং উদ্বোধিত হয় এবং অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তবুও দর্শন শ্রবণাদির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

নায়িকাভেদ পূর্বরাগের প্রকারভেদ আছে। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভার পূর্বরাগ একরূপ নয়। 'অভিযোগ' পূর্বরাগের অপরিহার্য অঙ্গ। স্বপ্ন, সাক্ষাৎ দর্শন অথবা চিত্রপটেই হোক— যাঁকে দর্শনমাত্র প্রেমের সঞ্চার হয়; সখীমুখে, দূতীমুখে, ভাটমুখে অথবা গুণিজনের গানে যাঁর গুণের কথা শ্রবণে মুগ্ধতা জাগে, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই

যে বিবিধ প্রচেষ্টা— তার নামই অভিযোগ।

পূর্বরাগে অপ্রাপ্তিতে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, বৈয়গ্র্য, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মরণোদ্যম পর্যন্ত বিভিন্নভাবের উদয় হয়।

সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে পূর্বরাগ তিনপ্রকার। সাধারণী রতিতে ব্যাধি থেকে মৃত্যুর পরিবর্তে বিলাপ পর্যন্ত ষোলটি ভাবের উদয় হয়, কিন্তু এই ভাবসমূহ তেমন গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।

সমঞ্জসা রতিতে পূর্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ক্রমশ উৎপন্ন হয়।

সমর্থা রতিতে নায়িকা-শিরোমণি মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধাতেই সমস্তভাবের পর্যবসান। এই রতি রাগাত্মিকা রতি। এই রতিকেই বলা হয় প্রৌঢ়া রতি। এই রতিতে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়তা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু অর্থাৎ মরণোদ্যম— এই দশটি দশা।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১। প্রৌঢ়া রতি কাকে বলে?

.....

.....

.....

.....

২। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে মৃত্যু দশা নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী কেন 'মরণোদ্যম'—

এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন— আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৩। প্রৌঢ়া পূর্বরাগের দশটি দশার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

.....

.....

.....

## ২.৪ অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বৈষ্ণব পদকর্তারা সাধারণী নায়িকার উল্লেখ করেননি কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মধুরা রতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। — (ক) সাধারণী রতি, (খ) সমঞ্জসা রতি এবং (গ) সমর্থা রতি। এই রতি সমূহের মধ্যে সাধারণী রতিতে জাত কৃষ্ণ প্রেম মোটেই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না। কেন-না এ রতি হচ্ছে সাক্ষাৎ দর্শনজাত এবং সম্ভোগেচ্ছাই হল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। সম্ভোগান্তে এই রতির পরিসমাপ্তি ঘটে বলেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই রতিকে বলা হয়েছে নাতিসুলভা। সাধারণী নায়িকা কুব্জাতেই এর প্রকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল।

সাধারণী নায়িকা সাধারণী রতিতে বিহ্বল। এই রতি স্থূল।

কিন্তু কুব্জা সাধারণী নায়িকাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সাধারণী রতিতে তাঁর প্রেম জাত হলেও কৃষ্ণৈকপ্রাণা কুব্জা নিরন্তর কৃষ্ণ নিষ্ঠাহেতু শেষ পর্যন্ত স্বকীয়া নায়িকাতে উন্নীতা হয়েছিলেন।

যে প্রেমের সম্ভোগান্তেই ইতি ঘটে সেই প্রেমের সঙ্গে প্রাকৃত প্রেমের কোনো পার্থক্য নেই। এইজন্য বৈষ্ণবগণ এই সাধারণী রতিকে রসশাস্ত্রে স্থান দেননি।

(২) প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ সম্পর্কে কিছু বলেছেন কিনা অথবা বৈষ্ণব পদাবলিতে আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক পদগুলি পাই তা বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত কিনা। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার পূর্বরাগের দশটি দশার প্রসঙ্গে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা সমস্তই নায়িকার পূর্বরাগকে সূচিত করেছে। তিনি নায়কের পূর্বরাগ সম্পর্কে কিছু বলেননি।

তবে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বদাই নায়কের পূর্বরাগ বা নায়কের বিরহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন -- বেদে পুরূরবার বিরহ, রামায়ণে রামের বিরহ, কালিদাসে যক্ষের বিরহ। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান' কে কেন্দ্রে রেখে 'সর্বগুণমণি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি'-র প্রতি লক্ষ রেখে নায়িকার পূর্বরাগের উপরেই অধিক প্রাধান্য আরোপ করেছিলেন। তাই 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার কৃষ্ণের মান দেখালেও কৃষ্ণের পূর্বরাগ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

তবে বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ রাধার প্রতি পরকীয়া প্রেমের মাধুর্য আস্বাদনে 'সদাই উন্মুখ' শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। যেমন ---

"তড়িত বরণী হরিণ নয়নী
দেখিলুঁ আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিএগ অমিয়া ছানিয়া
গড়িল বা কোন রাজে।।" ( দীন চণ্ডীদাস)

অথবা ---  " নবীন কিশোরি  মেঘের বিজুরী

চমকি চলিয়া গেল।

সঙ্গের ও সঙ্গিনী  সকল কামিনী

ততহি উদয় ভেল।।

সই দেখি নাই হেন নারী।"  (দ্বিজ চণ্ডীদাস)

বৈষ্ণব পদকর্তা শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি, রাধার দশ দশার মতই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের দশ দশার পদও রচনা করেছিলেন। যেমন — শ্রীকৃষ্ণের লালসাদি ব্যক্ত হয়েছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে--

রাধার প্রতি সখি বলেছেন --

"শুনিতে তোহারি বাত।

পুলকে ভরয়ে গাত।।

অবনত করি শির।

লোচনে ঝরয়ে নীর।।"

শ্রীকৃষ্ণের ব্যাধি মোহ মৃত্যু ইত্যাদি দশার বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে রাধার প্রতি সখির উক্তিতে।----

"এ ধনি এ ধনি বচন শুন।

নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন।।

দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।

যত তত করি না হয়ে শুধি।।

.....

সোনার বরণ হইল শ্যাম।

সোঙরি সোঙরি তোহার নাম।।

না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই।

কাঠের পুতলি রৈয়্যাছে চাই।।"  (দ্বিজ চণ্ডীদাস)

## ২.৫. আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আলোচ্য বিভাগে আমরা দেখতে পেলাম যে, শ্রীরূপ গোস্বামী সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের শৃঙ্গার রসের আদর্শকে মেনে যদিও আদিরস শৃঙ্গারের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যা লৌকিক নায়ক-নায়িকার আদর্শে হয়নি। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যের দৃষ্টিতে শৃঙ্গার রস হল মধুর বা 'উজ্জ্বল রস', এর নায়ক-নায়িকা অলৌকিক

ভাব বৃন্দাবনের রাধা এবং কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীরাধা তাঁর স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী শক্তির চরম পরাকাষ্ঠা মহাভাবময়ী। তাই লৌকিক রসের সীমা ছাড়িয়ে এই শৃঙ্গার রস মহাভাবময় অপার্থিব দিব্যলোকের 'মধুরাখ্য' চরম রসোপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী-কথিত শৃঙ্গার রসের ব্যাখ্যা এক অপ্রাকৃত পটভূমিকায় স্থাপিত হয়ে সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে এক অভিনব সংযোজন ঘটিয়েছে।

শ্রীভগবানের স্বরূপভূত এই দিব্য প্রেম যা বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস বা 'ভক্তিরসরাট্' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা প্রধানত দুই প্রকার— বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে রয়েছে অপ্রাপ্তিজনিতভাব। কিন্তু এই অপ্রাপ্তি বা বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ শৃঙ্গারকেই পরিপুষ্ট করে। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের এই চতুর্বিধার মধ্যে পূর্বরাগই প্রথম পর্যায়। মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার দর্শন-শ্রবণাদি থেকে জাত রতিকে পূর্বরাগ বলা হয়। দর্শনজাত পূর্বরাগ তিনরূপ— সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন এবং স্বপ্নে দর্শন। বন্দিমুখে, দূতীমুখে, সখীমুখে, ভাটমুখে এবং গীতাদির দ্বারা নায়ক বা নায়িকার নাম-গুণ-আদি শ্রবণে জাত পূর্বরাগকে বলা হয় শ্রবণ-জাত পূর্বরাগ। বৈষ্ণব পদকর্তারা পূর্বরাগের পদাবলি রচনা করতে গিয়ে 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র অনুশাসন মেনেও আরো কিছু নতুনত্ব যোগ করেছেন। রতিভেদে পূর্বরাগ ত্রিধা বিভক্ত— সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা বা প্রৌঢ় পূর্বরাগ।

সাধারণী পূর্বরাগে ইন্দ্রিয়-সুখ-চরিতার্থতার বাসনা থাকায় এই রতিতে গাঢ়তার অভাব আছে।

সমঞ্জসা রতিতে বিধিমতে বিবাহের দ্বারা সম্ভোগেচ্ছার প্রকাশ ঘটে। এই সমঞ্জসা নায়িকার অভিসারিকা-রূপ নেই।

সমর্থা রতিতে স্বসুখ বাসনা, ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসার লেশমাত্র নেই , আছে একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা। এর জন্য দেহধর্ম, বেদধর্ম আদিও তুচ্ছ হয়ে যায়। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে এই ত্যাগোজ্জ্বল কাম গন্ধহীন সমর্থা রতিই শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপিনীগণের এই সমর্থা রতি। এই সমর্থা রতিজাত পূর্বরাগই হল প্রৌঢ় পূর্বরাগ।

এই প্রৌঢ় পূর্বরাগে লালসা-উদ্বেগ-জাগর্যা-তানব-জড়িমা-বৈয়গ্র্য-ব্যাধি-উন্মাদ-মোহ-মৃত্যু আদি দশটি দশা প্রকাশ পায়।

তবে মৃত্যু যেহেতু শৃঙ্গার রসের প্রতিকূল, তাই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকার মৃত্যুকে স্বীকার না করে তাকে মরণোদ্যম অর্থাৎ অন্তিম দশা বলেছেন।

পদাবলি সাহিত্যে কেবল নায়িকারই নয়, নায়কেরও পূর্বরাগের দশ দশার পদ রচনা করেছেন কবিগণ। বর্তমান বিভাগে আমরা শৃঙ্গার-রসের সুবিস্তৃত আলোচনারই চেষ্টা করেছি। তবে যেহেতু আপনাদের পাঠ্যতালিকায় কেবলমাত্র 'পূর্বরাগ'কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই আমাদের আলোচনাও সে-পর্যন্তই বিস্তৃতি লাভ করেছে।

## ২.৬. প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

এবার আমরা এখানে কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা আলোচনা করব।

**ভক্তিরসামৃতসিন্ধু :**

এই গ্রন্থ শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বেদ-সম। এতে ভক্তিরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতির কথা আছে। এর মধ্যে রচয়িতার বিষয় নৈপুণ্য, সরস কবিত্ব, সূক্ষ্ম-দার্শনিকত্ব ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই এই গ্রন্থ রচিত। ভগবানের প্রতি যে রতি, তা কীভাবে রাগানুগায় পরিণত হয়ে ভক্তের কাছে একমাত্র কৃষ্ণ ভজনকেই সুখ বলে প্রতিভাত করায়, চিত্তবৃত্তি অনুসারে ভক্তির বৈচিত্র্য, পার্থিব প্রেম ও ভগবানের প্রতি অপার্থিব প্রেম ভক্তির পার্থক্য, প্রেমভাবের ভক্তিরসে পরিণতি--- ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

**শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী :**

বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর একজন খ্যাতনামা গোস্বামী এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাই। তিনি আনুমানিক ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে পণ্ডিত হয়েছিলেন। ইনি এবং তাঁর ভাই প্রথম জীবনে গৌড়রাজ হুসেন শাহের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। অতিশয় বুদ্ধিমত্তার জন্য গৌড়রাজ সনাতনকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রাকালে রামকেলিতে শুভ বিজয় করার সময় শ্রীরূপ-সনাতন রাজ-বেশ ত্যাগ করে দীনহীনবেশে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করে কৃতার্থ হন। এরপর রাজকার্যে অমনোযোগী সনাতনকে গৌড়রাজ চেষ্টা করেও রাজকার্যে মনোযোগী করতে না পেরে তাঁকে কারাগারে বন্দী করেন। বহু কৌশলে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন একাকী পায়ে হেঁটে কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন। মহাপ্রভু দুই মাস তাঁকে নিজের কাছে রেখে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করে তাঁকে বৃন্দাবনের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত করেন। শ্রীসনাতন বহু গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে শ্রীহরিভক্তি বিলাস ও দিগ্‌দর্শিনী টীকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**শ্রীজীব গোস্বামী :**

ইনি বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীগণের মধ্যে খ্যাতনামা একজন। শ্রীরূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। এঁর পিতার নাম অনুপম। ইনি প্রসিদ্ধ ভক্তি-গ্রন্থ প্রণেতা ; চিরকুমার। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন। শ্রীরূপ-সনাতন সর্বত্যাগী হয়ে বৃন্দাবনে যাবার পর থেকেই তাঁরও বৈরাগ্য প্রবল হয়ে ওঠে। নবদ্বীপে অধ্যয়নের দলে যাত্রা করে তিনি শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করেন। সেখান থেকে কাশীধামে গিয়ে বেদান্ত পাঠ করে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে গোস্বামীদের চরণাশ্রয় লাভ করেন। শ্রীজীব পণ্ডিত ছিলেন। এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে— 'ষট্-সন্দর্ভ', 'ধাতুসংগ্রহ', 'ভক্তিরসামৃতবিশেষ', 'রসামৃতটীকা', 'উজ্জ্বলটীকা', 'গায়ত্রীভাষ্য' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**সমঞ্জসা রতি :**

সমঞ্জসা রতি সম্পর্কে বলা হয়েছে -- "পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা" অর্থাৎ এ রতি পত্নীত্বের অভিমান থেকে এবং গুণাদি শ্রবণ থেকে জাত হয়। এখানে সম্ভোগ তৃষ্ণা বর্তমান থাকে , নিত্যকায় স্বকীয়া নায়িকা রুক্মিণী আদিতে এই তৃষ্ণা সুপ্ত থাকে। সম্ভোগস্পৃহা আছে বলেই এবং সম্পর্কানুগা বলে এই রতি কৃষ্ণ বশীকরণে অসমর্থা।

**সমর্থা রতি :**

কৃষ্ণ বিষয়ক শব্দ ইত্যাদির যৎকিঞ্চিৎ মাত্র শ্রুত হলে বা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গন্ধাদি মুহূর্তে কূলধর্ম, বেদধর্ম ইত্যাদিকে ভুলিয়ে দেয়— এই রতিই সমর্থা রতি। একে বলা হয়েছে সান্দ্রতমা। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা-দ্বারা উজ্জীবিত এই রতিতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র থাকে না বলেই কৃষ্ণকে পরিপূর্ণ বশীকরণে এই রতি সমর্থা। রাধাতেই সমর্থা রতি পরাকাষ্ঠা পেয়েছে।

**ভক্তিরস :**

রস একপ্রকার মানসিক আস্বাদময় সম্বিত বিশেষ। রসের স্বরূপ হল, রস স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, ব্রহ্মস্বাদ সহোদর। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে এই রসের সংখ্যা শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ আদি ভেদে নয়টি। কিন্তু বৈষ্ণব রসবাদে রসের নতুনতর বিভাগ সৃজিত হয়েছে। তাঁদের মতে মূল রস হল ভক্তিরস। প্রাচীন আলংকারিকেরা ভক্তির রসত্বের কথা স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে ভক্তি হল দেবাদিবিষয়া রতি, অতএব ভাব। কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকার একথা স্বীকার করেননি। যেহেতু ভাব ছাড়া রস হতে পারে না, এবং রস ছাড়া ভাব হয় না, তাই ভক্তিভাবও ভক্তি রসে পরিণত হয়। ভগবান রসস্বরূপ। রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। একমাত্র ভক্তির বশেই সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ পরমপুরুষের মাধুর্য ও লীলারস আস্বাদনের দ্বারা আনন্দ অনুভব করা যায়। রসিকশেখর রসময় কলেবর অসমোর্দ্ধমাধুর্য কৃষ্ণের আস্বাদ্যতার কোন তল নেই, কুল নেই। স্বরূপের আনন্দ আস্বাদন এবং স্বরূপ শক্তির আনন্দ আস্বাদন অর্থে তাঁর স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ যে প্রেমরস, তার আস্বাদন। এই প্রেম রসই ভক্তিরস। এই প্রেমরস অলৌকিক। লৌকিক চিত্তবৃত্তির সহায়তায় এই প্রেম-ভক্তিরস আস্বাদন বা অনুভব করা যায় না। ভক্তিরস দুই প্রকার— মুখ্য এবং গৌণ ভক্তিরস। মুখ্য ভক্তিরসের পঞ্চভেদ— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। আর গৌণ ভক্তিরস সপ্ত প্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস। ভক্ত বা পরিকরভেদেই রসের প্রভেদ হয়। মুখ্য ভক্তিরসগুলি গুণগত উৎকৃষ্টতার জন্য গভীরতম হয়। সেই হিসেবে মধুর রস সর্বোত্তম ভক্তিরস। শ্রীরূপ গোস্বামী তাই একে 'ভক্তিরসরাট্' আখ্যা দিয়েছেন।

**মুগ্ধা নায়িকা :**

যে নায়িকার নবীন বয়স, অল্পমাত্র কাম, রতি বিষয়ে বাম, সখীদের অধীনা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জা অথচ গোপনভাবে যত্নশীলা, প্রিয়তম অপরাধী হলে তাঁর প্রতি সজললোচনা, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্তা এবং সতত মান বিষয়ে পরাঙ্মুখী

তাকেই মুগ্ধা নায়িকা বলা হয়।

**মধ্যা নায়িকা :**

যে নায়িকার লজ্জা ও মদন দুই-ই তুল্য, যিনি নবযৌবনা, বাক্যে ঈষৎ প্রগ্‌লভা, মূর্চ্ছা পর্যন্ত সুরত বিষয়ে ক্ষমতাশালিনী এবং কোন স্থানে মৃদু ও কোন স্থানে বা মানে কর্কশ, তাকেই মধ্যা নায়িকা বলে।

**প্রগল্‌ভা নায়িকা :**

যে নায়িকা পূর্ণযৌবনা, মদান্ধ, বিপরীত সম্ভোগে উৎসুক, প্রচুর ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রসবশে প্রিয়তমকে আক্রমণকারিণী, তথা যার অতিশয় প্রৌঢ়চেষ্টা এবং মানবিষয়ে যিনি কর্কশ— এ সমস্ত গুণশালিনী নায়িকাকে প্রগল্‌ভা বলে।

**ধীরা নায়িকা :**

যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়তমকে উপহাস-সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁকে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে ধীরা নায়িকা বলে। ধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা আবার দুই প্রকার— একপ্রকার হলেন মানিনী অবস্থায় সম্ভোগ বিষয়ে উদাসিনী। দ্বিতীয় প্রকার হলেন, ভাব-গোপনকারিণী এবং আদরান্বিতা।

**অধীরা নায়িকা :**

যে নায়িকা রোষ প্রকাশ পূর্বক নায়কের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে তাঁকে অধীরা নায়িকা বলে। অধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা ক্রোধবশত কান্তকে নিষ্ঠুররূপে তাড়না করেন।

**ধীরাধীরা নায়িকা :**

যে নায়িকা অপরাধী প্রিয়তমের প্রতি অশ্রুপূর্ণনয়নে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন তাঁকে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে ধীরাধীরা নায়িকা বলে।

## ২.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

(১) পূর্বরাগের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এই পর্যায়ের পদ রচনায় বৈষ্ণব পদ-কর্তারা 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কারের নির্দেশ কতটুকু অনুসরণ করেছেন এবং কতটুকু স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন উদাহরণ-সহ আলোচনা করুন।

(২) 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের 'নায়িকাভেদ প্রকরণম্' অবলম্বনে পরোঢ়া নায়িকাদের বিভাজন একটি রৈখিক চিত্রের দ্বারা নির্দেশ করুন এবং অষ্টনায়িকার বিভাজনে যে যে বিভাগে সম্ভোগ শৃঙ্গার প্রাধান্য লাভ করেছে উদাহরণ-সহ সেগুলোর আলোচনা করুন।

(৩) বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী নায়িকা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকার নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(৪) শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসরণে পূর্বরাগের দশটি দশা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

(৫) শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অবলম্বনে হরিপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করুন।

(৬) বৈষ্ণবের পূর্বরাগ লৌকিক বিষয় নয়, পরন্তু তা অলৌকিক। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের অনুসরণে উক্তিটির সত্যতা বিচার করুন।

(৭) 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের 'নায়িকাভেদ প্রকরণে' নায়িকাদের সর্বমোট কত প্রকার ভেদ দেখানো হয়েছে? একটি রৈখিক চিত্রের দ্বারা এই ভেদ নির্দেশ করে এ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

(৮) প্রৌঢ় পূর্বরাগ বলতে কী বোঝেন? বৈষ্ণব পদাবলি থেকে উদাহরণ দিয়ে এই পূর্বরাগের দশটি দশার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(৯) অষ্টনায়িকা বলতে কী বোঝেন? বৈষ্ণব পদসাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রত্যেক প্রকার নায়িকার সংজ্ঞা নির্দেশ করুন।

(১০) পূর্বরাগ কাকে বলে? পূর্বরাগ কত প্রকারে ও কী কী ভাবে হতে পারে? 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অনুসরণে পদাবলি থেকে উদাহরণ এবং সংজ্ঞাসহ প্রত্যেক প্রকার পূর্বরাগের বিস্তৃত আলোচনা করুন।

(১১) অভিসার বলতে কী বোঝায়? 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অনুসরণে বিভিন্ন প্রকার অভিসারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

(১২) অভিসারের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এই পর্যায়ের পদ রচনায় বৈষ্ণব কবিগণ 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কারের নির্দেশ কতটুকু মেনেছেন এবং নতুন কিছু সংযোজন করে স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন কি না উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(১৩) বৈষ্ণবের অভিসার পার্থিব জগতের অভিসার নয়, তা অলৌকিক এবং পরমকে পাবার সাধনা --'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অনুসরণে উক্তিটি আলোচনা করুন।

(১৪) লৌকিক জগতে আমরা যাকে বলি পরকীয়া প্রেম, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেন? — 'উজ্জ্বলনীলমণি' অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(১৫) শৃঙ্গার ভেদ সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি' অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(১৬) বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী শৃঙ্গারের ভেদ কয়টি এবং কী কী? উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(১৭) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ--

(ক) 'উজ্জ্বলনীলমণি'-বর্ণিত পরকীয়া প্রেম কেন অসামাজিক নয়, তা যে কোনো দুটি যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করুন।

(খ) নায়িকার ভেদ দেখাতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী সাধারণী নায়িকার উল্লেখ করেননি কেন?

(গ) বৈষ্ণবীয় পরকীয়া প্রেম অসামাজিক কি? যে কোনো দুটি যুক্তি দেখান।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা ক-জন? তাঁদের মধ্যে প্রধানা নায়িকা কারা এবং কে বা কারা সর্বশ্রেষ্ঠা?

(ঙ) উদাহরণসহ বৈয়গ্র্য দশার সংজ্ঞা নির্দেশ করুন।

(১৮) টীকা লিখুন ঃ----

শ্রীরূপ গোস্বামী ; উজ্জ্বলনীলমণি ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ; সনাতন গোস্বামী ; জীব গোস্বামী ; সমঞ্জসা রতি ; সমর্থা রতি; সাধারণী রতি ; তানব ; বিপ্রলম্ভ ; সম্ভোগ; দর্শনজাত পূর্বরাগ ; শ্রবণজাত পূর্বরাগ ; দিবাভিসার ; বর্ষাভিসার ; উন্মত্তাভিসার; তামসাভিসার ; স্বকীয়া প্রেম ; পরকীয়া প্রেম ।

## ২.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


১. 'উজ্জ্বলনীলমণি'— শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত

২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

৩. পদাবলী - পরিচয়— শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৪. গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব— উমা রায়

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)— শ্রীমন্ত কুমার জানা

৬. বৈষ্ণব কবিতা : দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য বিশ্লেষণ — ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য

৭. প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য — তত্ত্ববিশ্লেষণ ও রসবিচার — কালিদাস রায়

৮. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস — দেবিদাস ভট্টাচার্য

৯. বৈষ্ণব রস প্রকাশ — ক্ষুদিরাম দাস

১০. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (১-৫) — রাধাগোবিন্দ নাথ

১১. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১২. Early History of Vaishnava faith and Movement in Bengali – S.K. De

১৩. Philosophical Foundation of Bengal Vaishnavism – S.C. Chakraborty.


* * *

## বিভাগ- ৩
## চৈতন্যচরিতকাব্য
### চৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণ-রাধা-গৌরতত্ত্ব

**বিষয় বিন্যাস**


৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ চৈতন্য চরিতামৃত : কবি-পরিচিতি

৩.৩ চৈতন্যচরিতামৃত : গ্রন্থপরিচয়

৩.৪ চৈতন্য চরিতামৃত : তত্ত্ব-প্রসঙ্গ

৩.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৩.০ ভূমিকা (Introduction)

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত এক যুগান্তকারী ঘটনা। মধ্যযুগের বাংলাদেশে তিনি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্ব। মহাপ্রভু তাঁর ৪৮ বছরের জীবনের পরিসরে প্রেমের শক্তিতে বিপুল এক জাগরণ আনেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালি জীবনের সর্বতোমুখী জাগরণ ঘটেছে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত ও আদর্শ প্রচার করেন তাঁর অনুচরবর্গ। তাঁর প্রভাবে বাঙালির জীবনে যে ভাবমূলক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হল — সেই নব প্রবুদ্ধ জীবনচেতনা বাংলা সাহিত্যেরও গতি পরিবর্তন করল। তাঁর আবির্ভাবের ফলে একদিকে গড়ে উঠল নব-চেতনাময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনমূলক সাহিত্য অপরদিকে তাঁর অমৃতময় জীবনকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ও বাংলায় বিরচিত হল অজস্র চৈতন্যচরিত সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর জীবদ্দশাতেই এই জাতীয় সাহিত্যের সূত্রপাত।

বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী বিষয়ক কাব্য রচনার কৃতিত্ব বৃন্দাবন দাসের। আর এই সাহিত্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত ' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে রচয়িতার অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ কবিত্ব শক্তির সঙ্গে একাধারে দার্শনিকতা, ইতিহাস ইত্যাদি সহজ সরল সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নৈতিক , তাত্ত্বিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক আদি সকল বিষয়েরই মর্মোদ্‌ঘাটন হয়েছে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে।

শ্রীবৃন্দাবন দাসের লেখা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার পূর্বার্ধ হয় তবে কবিরাজ গোস্বামী - বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাপ্রভুর লীলার উত্তরার্ধ।

এবারে আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর মহান গ্রন্থের সুবিস্তৃত আলোচনা করব।

## ৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যে যে-পরিচ্ছেদ-সমূহ আপনাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তার বিষয়সমূহ হল, কৃষ্ণ-রাধা-গৌরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব, বেদান্ত বিচার এবং শিক্ষাষ্টক। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই বিষয়সমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি, যার একদিকে রয়েছে চৈতন্য-তত্ত্ব এবং চৈতন্য-সমর্থিত তত্ত্ব; অপরদিকে রয়েছে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা তথা চৈতন্য-ব্যাখ্যাত তত্ত্ব। বক্ষ্যমান বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে কৃষ্ণ-রাধা-গৌর-তত্ত্ব এবং চৈতন্য-সমার্থিত তত্ত্ব যাকে আমরা 'তত্ত্ব-প্রসঙ্গ' বলে অভিহিত করেছি। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাকে স্মরণে রেখে এই বিভাগের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কবি এবং কাব্য-পরিচিতি।

- বর্তমান বিভাগের আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারবেন —
- কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী।
- 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানির সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়।
- কৃষ্ণ-রাধা-গৌর-তত্ত্ব তথা মহাপ্রভুর অবির্ভাবের কারণসমূহ।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

বাংলার জাতীয় জীবনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। সমাজ বিপর্যয়ের এক চরম সংকট মুহূর্তে, সমগ্র হিন্দুজাতির মরণাপন্ন অবস্থার মাঝে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর অমৃতময় জীবনের স্পর্শে লুপ্তপ্রায় বাঙালি জাতির নবজাগরণ ঘটেছে। জাতিকে তিনি সর্বদিক থেকেই নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি উদার প্রেমধর্ম ও মানবতাবাদ প্রচারের মাধ্যমে সমাজের অসাম্য ও ভেদাভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন, ফলে ঘোষিত হল সেই মহাবাণী— "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ"। তাঁর পবিত্র জীবন ও বাণীর স্পর্শে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করে চৈতন্য সমকালীন ও চৈতন্যোত্তরকালের কবিরা সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত উৎকৃষ্ট চৈতন্য জীবনী কাব্য। পূর্বের দেবমুখী সাহিত্য পরিবর্তিত হয়ে এই প্রথম সমকালীন এক ঐতিহাসিক মানুষকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত

ঘটে। সমকালীন বাঙালির ভাবসাধনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনবোধের দিক পরিবর্তন সূচিত করেছে। মানুষের বন্দনা এক অভিনব সংযোজন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে যে নতুন সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা সমকালীন প্রথানুবর্তী গতানুগতিকভাব পরিমণ্ডলের মধ্যে মানবিক মহত্ত্ব ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শে নতুন জীবন-চেতনায় বাংলা সাহিত্যের দিকপরিবর্তন সূচিত করেছে। মহাপ্রভুর দিব্যভাব-সমৃদ্ধ অলৌকিক জীবন নতুন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে বিপুল প্রেরণা দিয়েছে।

প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থগুলিকে অনুসরণ করেই বাংলা ভাষায় চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কাব্য রচনার পথিকৃৎ বৃন্দাবন দাস। এরপর চৈতন্য-চরিত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচিত হয়।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যজীবনী বিষয়ক গ্রন্থগুলি এক অভিনব সংযোজন। আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

## ৩.২ চৈতন্য চরিতামৃত : কবি পরিচিতি

চৈতন্যচরিত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। অকৃতদার আদর্শ বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট ঝামটপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা দেবী। তাঁর জন্মকাল ও গ্রন্থ রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। একদা মধ্যবয়সে নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় বৃন্দাবনধাম ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মহাপীঠ। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তাঁর ভক্ত শিষ্য বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড়্ গোস্বামী এবং তাঁদের সর্বভারতীয় ভক্ত-পণ্ডিতেরা মুখ্যত সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবন-বাণীকে প্রকাশের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বৃন্দাবনে পৌঁছে কৃষ্ণদাস রূপ ও সনাতনের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের তিরোধানের পরে রঘুনাথ দাসের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

একদিকে যেমন চৈতন্য ধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার প্রতি অপার কৌতুহল ও আগ্রহ ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ রচনার পূর্বেই চৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রচারের জন্য চৈতন্যমাহাত্ম্য বিষয়ক বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়ে যায়। কৃষ্ণদাসের পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম জীবনী কাব্য। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের পূর্বে ভারতীয় ভাষায় লেখা কোনো চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে মহাপ্রভুর নীলাচল বাসের অন্তিম দ্বাদশ বৎসরের বিস্তারিত বিবরণ নেই। অথচ বৈষ্ণব ভক্তগণের কাছে মহাপ্রভুর এই সময়ের জীবনের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত আকর্ষক ও কৌতুহলোদ্দীপক। মহাপ্রভুর সেই সময়ের দিনগুলি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানরহিত দিব্যোন্মাদ আবেগে অতিবাহিত হত। সেই মহান পুরুষের ভাবোন্মত্ত জীবনের লীলাকথা জানতে বৈষ্ণব ভক্তগণের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বৃন্দাবনের গোস্বামী ও মহাজনেরা মহাপ্রভুর জীবনের শেষ বারো বছরের ইতিকথা রচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-ভক্ত ও পণ্ডিত-কবি এবং বয়সে অতিশয় প্রবীণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে। এই অনুরোধ কৃষ্ণদাস রক্ষা করতে সংকল্পবদ্ধ হন সেই পরিণত বয়সে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় মহাগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'।

১৬১২ অথবা ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণদাস তাঁর এই মহাগ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। যখন গ্রন্থ রচনা শেষ হয় তখন তিনি ' অতিবৃদ্ধ জরাতুর' এবং কর্মে প্রায় অশক্ত হয়ে পড়েন। কবি লিখছেন —

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ।।
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।।"

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁর গ্রন্থে বার্ধক্যের কোনো চিহ্নই নেই। বরং কবির নবীন ও সতেজ মনের জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর রয়েছে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'। চৈতন্যচরিত সাহিত্যের এটিই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। অগাধ মনীষা, ভক্তিনিষ্ঠা ও কবি প্রাণতার সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

চৈতন্য চরিত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো অগাধ-মনীষাসম্পন্ন বিরাট প্রতিভাশালী কবি ব্যক্তিত্ব বিরল। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি তিনি। পাণ্ডিত্য ও মনীষার দিক থেকে দর্শন শাস্ত্রে তাঁর কি বিপুল অধিকার ছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে। তিনি সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম কাব্য প্রবক্তা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছেন। বৈষ্ণবীয় ধর্মাদর্শে দীক্ষিত হয়েও তিনি নীরস দুরূহ জটিল তত্ত্বদর্শনকে সহজ সরল কাব্যভাষার রসাশ্রিত করে তুলেছেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনী অর্থাৎ তাঁর ধর্মাদর্শের অমৃতবাণী পরিবেশন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চিরঞ্জীব খ্যাতিত্বের স্বর্ণ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

**আত্মসমীক্ষমূলক প্রশ্ন**

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিন।

.....

.....

.....

.....

২. কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন কীরূপে?

.....

.....

.....

.....

### ৩.৩ চৈতন্যচরিতামৃত : গ্রন্থ পরিচয়

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলা ভাষায় লেখা কৃষ্ণদাস কবিরাজের তৃতীয় এবং সর্বশেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ, কেউ বলেছেন ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি। এই সমস্ত মতের সমন্বয় সাধন করে আমরা বলতে পারি যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কাব্য রচনা সম্পূর্ণ হয়।

এই গ্রন্থটিতে কবির অসাধারণ মনস্বিতা, অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য এবং অদ্বিতীয় কবিত্ব শক্তির সঙ্গে সুগম্ভীর দার্শনিকতা, কাব্যরস, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি সহজ সুমধুর ভাবেও সুস্পষ্ট ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নৈতিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই স্থূল ও সূক্ষ্মমর্ম এই গ্রন্থে অশেষ দক্ষতা ও পরম রসজ্ঞতার সঙ্গে সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি এবং বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণ রচিত গ্রন্থাদি ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুখ্যত — (১) শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা, (২) শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা, এবং (৩) শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করেছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। বস্তুত, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' যদি চৈতন্য লীলার পূর্বার্ধ হয়

তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যলীলার উত্তরার্ধ। বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভগবত-তত্ত্বকে পরিস্ফুট করে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর কবিরাজ গোস্বামী এই ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে দার্শনিক প্রণালীর অবলম্বনে অবতারের মুখ্য কারণ নির্দেশ করে তার আলোচনা, আস্বাদন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কাব্যে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাবাঢ্যত্ব প্রদর্শিত হয়েছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত — আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় **১৭** , মধ্যলীলায **২৫** এবং অন্ত্যলীলায় **২০** টি পরিচ্ছেদ। এর শ্লোক সংখ্যা — কবিরাজ গোস্বামী-কৃত **৯৭**+ উদ্ধৃত শ্লোক **৯১৫**= মোট **১০১২**। পয়ার সংখ্যা — আদিতে **২০৮৯** + মধ্যে **৫৩৭৮**+ অন্তে **৩০৩৬** = মোট **১০৫০৩**। অর্থাৎ শ্লোক ও পয়ার সংখ্যা সর্বমোট **১১১৫১৫** । তিন লীলায় বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনুবাদ যথাক্রমে **১৭** শ, **২৫** শ ও **২০** শ পরিচ্ছেদে লিখিত হয়েছে। এছাড়াও মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে নীলাচল লীলার ধারাবাহিক অনুবাদ লিখতে গিয়ে মধ্য ও অন্ত্যলীলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের সাধারণ তত্ত্ব, দ্বিতীয়ে বিশেষ তত্ত্ব, তৃতীয়ে অবতারের বাহ্য উদ্দেশ্য, চতুর্থে অন্তরঙ্গ হেতু, পঞ্চমে নিত্যানন্দতত্ত্ব, ষষ্ঠে অদ্বৈততত্ত্ব সূচিত হয়েছে। সপ্তমে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান, অষ্টমে গ্রন্থের উপক্রমণিকা, নবমে শ্রীচৈতন্যের প্রেমফলদানের ঔদার্য দেখানো হয়েছে। দশম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গঙ্গাধরের শাখা সমূহের বিবৃতি আছে এবং ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত বিভিন্ন লীলা, ঘটনাবলি ও গ্রন্থানুবাদ লিখিত হয়েছে।

মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদ শ্রীরূপ সনাতন বৃত্তান্ত, মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্র, দ্বিতীয়ে শেষ দ্বাদশ বর্ষের লীলার সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য, তৃতীয়ে সন্ন্যাসের পরবর্তী ঘটনা, রাঢ়ভ্রমণ, অদ্বৈত গৃহে আগমন। চতুর্থ ও পঞ্চমে নীলাচল পথে বিভিন্ন স্থানের আখ্যান ও লীলা। ষষ্ঠে নীলাচলে আগমন ও সার্বভৌম-মিলন, সপ্তমে দক্ষিণ যাত্রা, অষ্টমে শ্রীরামানন্দের সঙ্গে মিলন, নবমে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, দশম ও একাদশে পুরীতে প্রত্যাগমন ও ভক্ত সম্মিলন, দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত নীলাচলের ঘটনা, ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা ও প্রত্যাগমন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশে বৃন্দাবনে যাত্রা ও ভ্রমণ, ঊনবিংশে প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষা, বিংশ থেকে পঞ্চবিংশ পর্যন্ত কাশীতে সনাতন-শিক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্বব্যাখ্যা বর্ণিত।

অন্ত্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের সঙ্গে দ্বিতীয় মিলন, দ্বিতীয়ে ছোটো হরিদাসের বর্জন, তৃতীয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা, নাম মহিমা ইত্যাদি, চতুর্থে সনাতনের সঙ্গে পুনর্মিলন, পঞ্চমে রামানন্দ-মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ইত্যাদি, ষষ্ঠে দাসগোস্বামীর প্রসঙ্গ ইত্যাদি, সপ্তমে বল্লভ -ভট্ট মিলন,অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর কটাক্ষে ভিক্ষা সঙ্কোচন, নবমে গোপীনাথের উদ্ধার, দশমে রাঘবের ঝালি, একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্বাণ মহোৎসব, দ্বাদশে জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত, ত্রয়োদশে জগদানন্দের বৃন্দাবন যাত্রা, রঘুনাথ ভট্ট সহমিলন ইত্যাদি, চতুর্দশ ও পঞ্চদশে দিব্যোন্মাদ, অন্তর্দশায় বৃন্দাবন দর্শন ও কৃষ্ণান্বেষণ, ষোড়শে কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গ ইত্যাদি, সপ্তদশে তেলেঙ্গা গাভীর মধ্যে পতন,

অষ্টাদশে সমুদ্রে পতন, ঊনবিংশে বিরহ প্রলাপ। ইত্যাদি এবং বিংশে শিক্ষাষ্টক-আস্বাদন ও গ্রন্থানুবাদ।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি শ্রীরূপের গ্রন্থাবলির সুধায় স্নাত। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপের গ্রন্থ থেকে অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে এই গ্রন্থটিকে অলঙ্কৃত করেছেন। এছাড়াও কবিরাজের নিজস্ব লোকাতীত ভক্তির অনুভব এখানে ব্যক্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এর একটি সংস্কৃত টীকা লেখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটিতে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার লাবণ্যের অন্তরালে অনন্ত শক্তি নিহিত রয়েছে। কৃষ্ণদাসের হাতে বাংলা ভাষার ওজস্বিতা বৃদ্ধি পেল। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সম্প্রদায় বিশেষের দুরূহ জটিল তত্ত্ব ও নানা ঘটনার সরস বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী কবির পরিচয় রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাসে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক মহান কাব্য।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যজীবনকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থখানিই চৈতন্যচরিত সাহিত্যের সম্পূরক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজই সর্বপ্রথম সরলভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের জন্য চৈতন্য দর্শনের আনুষ্ঠানিক ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। তাঁর কাব্য বৈষ্ণব দর্শনকে উপলব্ধি করার দর্পণ স্বরূপ। পরিমিত বাক্যবিন্যাস, ভক্তি-তন্ময়তা ও অলঙ্কারের সমন্বয়ে চৈতন্যচরিতামৃত দর্শন ও কাব্যের যুক্তবেণী রচনা করেছে। অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব, সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, রাগানুগাভক্তি, প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত, সখী সাধনা ও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বাদি জটিল ধর্মতত্ত্বকে কৃষ্ণদাস এক একটা উপমা, সুভাষিত শব্দচয়ন ও ছন্দের ব্যবহারে, ঋজু বর্ণনাগুণে সহজবোধ্য করে তুলেছেন।

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনার ধারাবাহিকতার ক্রমপর্যায় অনুসৃত হয়নি। কবি মহাপ্রভুর জীবনীকে অবলম্বন করে অত্যন্ত ভক্তি ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর জীবনের পবিত্র আদর্শ তথা জীবনামৃত প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সরল ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। বাস্তব জীবনবোধ, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, দার্শনিক মননশীলতা, ভক্তিভাব, বিচারবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তির সমন্বয়ে তাঁর গ্রন্থ অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। আসলে কৃষ্ণদাস স্বভাবত কবি ছিলেন বলেই তাঁর ক্রান্তদৃষ্টিতে ধর্মতত্ত্বের মতো কঠিন জিনিস সর্বজন হৃদয়বেদ্য রস বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মহাপুরুষ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করেছিল, সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি পুরুষের জীবন সাধনায় যে আধ্যাত্মিকতার স্বত:স্ফূর্ত বিকাশ ঘটেছিল— তাকেই নয় বছরের অতন্দ্র সাধনায় সুবিস্তৃত ধর্মনৈতিক পটভূমিতে সামগ্রিক রূপদানে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন কৃষ্ণদাস। সুগভীর দার্শনিক বক্তব্য বিষয় নিপুণ কবিত্বশক্তির রসগুণে মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

২. 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানিতে মহাপ্রভুর যে রূপ ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৩. 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানিতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

## ৩.৪ চৈতন্যেচরিতামৃত : তত্ত্ব-প্রসঙ্গ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত এক যুগান্তকারী ঘটনা। মধ্যযুগের এক ক্রান্তিকালে তাঁর আবির্ভাব। তিনি তাঁর ৪৮ বৎসর জীবনের পরিসরে প্রেমের শক্তিতে এক বিপুল জাগরণ আনেন। বহিরঙ্গে নাম সঙ্কীর্তন এবং অন্তরঙ্গে রস আস্বাদন দ্বারা তিনি চিত্তলোকে এক দিব্য-ভাবের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যুগাবতার রূপেই তিনি ধরাধামে এসেছিলেন।

বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যাবির্ভাবের কারণ দেখিয়েছেন নাম-সংকীর্তন প্রচারের জন্য। তবে বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীগণ তাঁর আবির্ভাবের গূঢ় দার্শনিক কারণটি দেখিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে সরলভাবে সেই কারণটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে আমরা চৈতন্যাবির্ভাবের কারণটি দেখাতে পারি —

"বহিরঙ্গ ভাবে করে নাম সংকীর্তন।

অন্তরঙ্গ ভাবে করে রস আস্বাদন।।"

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের হেতু প্রধানত দুটি — বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। নিম্নে একটি রেখাচিত্রের দ্বারা অবতারের কারণটি বোঝানো হল। —

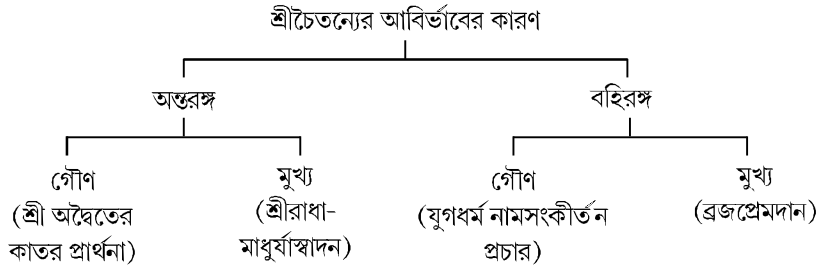


আমরা এখানে চৈতন্যাবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ থেকে আলোচনা শুরু করব।

জগৎ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির কাজ। এই জগতে ধর্মের গ্লানি দূর করে অধর্মকে বিনাশ করে ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত, সাধুর পরিত্রাণ এবং অসাধুর বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাঁর আগমন হল বহিরঙ্গ হেতু।

এই বহিরঙ্গ হেতুর অন্তর্গত নামদান ও প্রেমদান — এই দুই-ই জীবের জন্য।

নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামপ্রেম বিতরণে জগতকে ধন্য করেছিলেন। কোনো উপদেশের মাধ্যমে নয়, আপন জীবনচর্যার মাধ্যমে মহাপ্রভু নাম-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকট করে তুললেন।

"আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার।

নাম বিনা কলিকালে ধর্ম নাহি আর"।।

আচণ্ডাল -ব্রাহ্মণকে এই নামপ্রেম বিতরণ করেছেন তিনি —

"আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন।।

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।

নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে।।"

প্রেমদানের ইচ্ছা ভগবানের কৃপাশক্তির প্রেরণাতেই জাগে। প্রেমে আনে শান্তি। অশান্ত, ভক্তিবিমুখ জীব শান্ত হলেই শান্তির আস্বাদন হতে পারে। অথচ এই শান্তিস্বরূপ প্রেম দিতে পারেন একমাত্র ভগবান। কারণ —

"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে।"

আর সেজন্যই —

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"

এতকাল যা দান করা হয়নি, তা দেবার জন্যই করুণার বশবর্তী হয়ে তিনি এলেন মর্ত্যলোকে।

আরো একটি ব্যাপার হল — বিষয়াবলম্বন শ্রীকৃষ্ণে নির্বিশেষ প্রেমবস্তু আছে। কিন্তু তাতে ভক্তোচিত আচরণ নেই। কারণ প্রেমিক ভক্তের সমস্ত আচরণের প্রাণ হল কৃষ্ণ-তৃষ্ণা যা শ্রীকৃষ্ণে নেই। তাই তিনি স্থির করলেন ----

"আপনি করিমু ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে।"

এই ভক্তি হল হ্লাদিনী শক্তির একটি বৃত্তি। এই হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ হলেন শ্রীরাধা, শ্রীরাধাই প্রেম ভক্তির পরম ভাণ্ডারী। তাই 'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার' নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

কিন্তু এহো বাহ্য। —

"প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।।

সত্য এহ হেতু কিন্তু এই বহিরঙ্গ।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের কাছে তাঁর আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ স্বতন্ত্র —

"অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।

রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ।।

সেই রস আস্বাদিতে হৈল অবতার।

আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।।"

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত মূর্তি, নিখিল আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ। আনন্দের আস্বাদন ও আনন্দীকরণ — আনন্দা শক্তির এই দুটি রূপ। রসিক শেখর রূপে রস-নির্যাস আস্বাদনের বাঞ্ছা ও পরম কারুণ্য বিগ্রহরূপে রাগ ভক্তি বিতরণের বাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অখণ্ড ইচ্ছার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে আবির্ভাবের এই-ই হল স্বরূপভূত প্রয়োজন বা গূঢ় অন্তরঙ্গ হেতু।

শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই পথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীস্বরূপ দামোদর জানিয়েছেন —

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কী দৃশো বানয়ৈবা -

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ

তদ্ ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ।।"

—অর্থাৎ (ক) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কী রূপ, (খ) শ্রীরাধা যা আস্বাদন করেন আমার সেই বিচিত্র মাধুর্য কীরূপ, এবং (গ) আমার অনুভব বশত শ্রীরাধা যে সুখ বা আনন্দ অনুভব করেন সেই আনন্দই বা কীরূপ ---

অর্থাৎ কৈছন রাধা প্রেম কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখ তিঁহো ভোর ---

এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লোভের বশীভূত হয়েই শচীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে 'রাধা ভাব সুবলিত তনু' শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হলেন। --- এই তিন প্রয়োজনেই অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর রূপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

শ্রীস্বরূপ দামোদর উক্ত শ্লোকটিতে একটি অভিনব শব্দ প্রয়োগ করেছেন --- 'লোভাৎ', অর্থাৎ লোভ বশতই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। চতুর ভক্তের প্রেম-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভগবানের গুপ্ত লোভ ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

এই লোভের বিশেষত্ব বা আবির্ভাবের প্রয়োজনকে আস্বাদন করতে হলে শ্রীরাধা-তত্ত্বের আলোচনা করতে হয়। শ্রীস্বরূপ দামোদর লিখেছেন —

"রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিঃ হ্লাদিনী শক্তি "।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর অনুবাদ করেছেন —

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।।"

রাধাকৃষ্ণ মূলে এক, লীলার জন্য তাঁদের এই দ্বিধা সত্তা । ---

"রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একহি স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।"

কারণ —

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহিশাস্ত্র পরমাণ।।"

তবু লীলারস আস্বাদন হেতু ব্রজধামে তাঁকে দ্বিধা বিভক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে শ্রীভগবানের ক্ষোভ ও লোভ —

"এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে তাহা নহে আস্বাদন।।
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।"

—এই লোভ বশতই চৈতন্য অবতারের আবির্ভাব —

"পূর্ব্বে ব্রজ বিলাসে সেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধার ভাবসার আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল।।"

যে আস্বাদন ব্রজে পূর্ণ হতে পারেনি , তাকে পূর্ণ করার জন্যেই রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়

স্বরূপে বিলাসরস আস্বাদনের নিমিত্ত কলিযুগে নদীয়ায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। —

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি।।"

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এই অন্তরঙ্গ কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চৈতন্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রাধার প্রেম মহিমা বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিকে 'চিচ্ছক্তি'ও বলা হয়। এই চিচ্ছক্তির তিনটি অভিব্যক্তি, যার মূলে রয়েছে তিন শক্তি — সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। নিম্নে একটি রেখা চিত্রের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ বোঝানো হল —

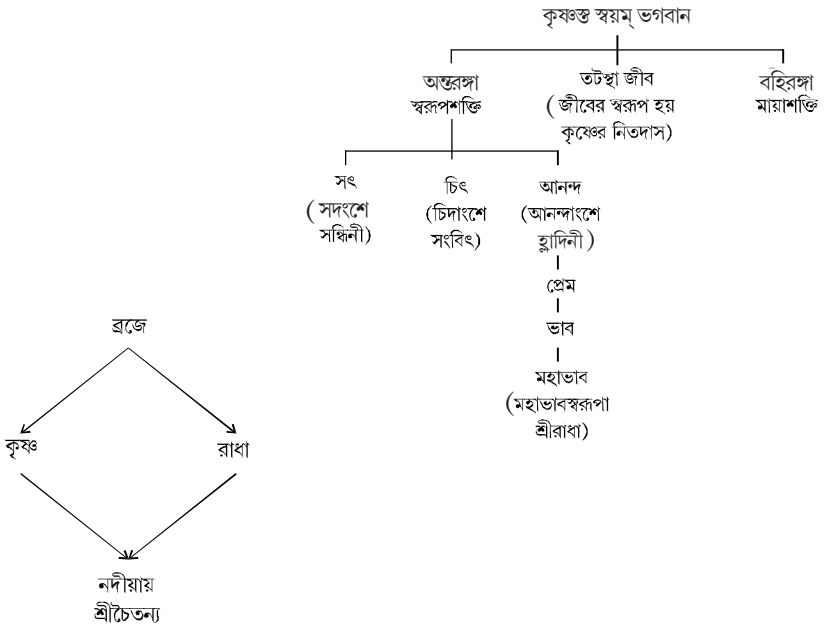


শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই নিবিষ্ট। রাধাও কৃষ্ণবাঞ্ছা পূরণের জন্য যতত চেষ্টিতা। তা সত্ত্বেও "নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ"। কারণ এই তিন আস্বাদন তৃষ্ণার প্রথমেই আছে রাধা প্রেমের মহিমা। এই মহিমা কৃষ্ণকেও উন্মাদ করে —

"রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত।।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।"

শুধু তাই নয়, রসঘন বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীভগবান প্রেমের বিষয়, তাই আশ্রয় জাতীয় সুখের জন্য তাঁর তৃষ্ণা জাগে —

"আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।"

কারণ, অদ্ভুত অনন্তপূর্ণ ভগবানের মাধুর্য যার আস্বাদন কেবল শ্রীরাধাই পেয়েছেন, সেজন্যই ভগবানের লোভ —

"রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।।"

সুতরাং এই তিন লোভের বশবর্তী হয়েই তাঁকে আসতে হল মর্ত্যলোকে। কারণ, শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার -বিনা এ-তিন বাঞ্ছা চরিতার্থ করবার আর উপায় নেই।

প্রকটকালের শেষ দ্বাদশ বৎসর রাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা ফুটে উঠেছে পদাবলি সাহিত্যে ও চৈতন্যচরিত সাহিত্যে।

ব্রজলোকে যে ঋণ শোধ করতে পারেন নি, যে তিন আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিয়ে এসেছে আবার এই নরলোকে — তা পূরণের জন্য এবার তিনি অন্যবেশে অবতীর্ণ হলেন; গৌরকান্তি দিয়ে ঢেকে নিলেন শ্যাম অঙ্গ — তবু ধরা পড়ে গেলেন আর এক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। রামানন্দের মুখে --

"না সো রমণ না হাম রমণী" —

শুনেই মহাপ্রভু স্বহস্তে রামানন্দের মুখ ঢেকেছেন। নব কলেবরে না এসে তাঁর উপায় ছিল না। কারণ অন্তরঙ্গ কারণের অপর একটি গৌণ কারণ ছিল। যে কারণটি হল ভক্তের আকুল আহ্বান। জীবের জন্য শ্রী অদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রাণ কেঁদেছিল বলেই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল —

"করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।

তবে যে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।।"

এবং ভক্ত-অন্ত-প্রাণ কৃষ্ণ ভক্তের সেই সত্যকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর কাতর ডাককে উপেক্ষা করতে পারেননি। —

"তাঁহার পিরীতে, আইলা তুরিতে,

উদয় নদীয়া মাঝ।।"

—এই হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বাংলার দর্শন মনীষাধৃত একটি অদ্ভুত পরমাশ্চর্যময় কারণ। ভাবের লালিত্যে, বৌদ্ধিক চেতনার জ্ঞান গভীরতায়শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণটি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর মহান গ্রন্থে। ভারতবর্ষের অন্যপ্রান্তে অনুরূপ ব্যাখ্যা দুর্লভ।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

মহাপ্রভুর আবির্ভাব এক অপূর্ব ঘটনা। বহিরঙ্গে নাম-সংকীর্তন এবং অন্তরঙ্গে রস-আস্বাদন দ্বারা তিনি চিত্তলোকে এক দিব্যভাবের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

যোড়শ শতকের জাতীয় জীবনের প্রবল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গতটে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। নবদ্বীপ তথা সমগ্র বাংলাদেশ তখন ধর্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ। শুষ্ক জ্ঞান-মার্গে বিচরণে,

আচার-বিচারের বাড়াবাড়িতে মানুষ তখন রত। ভক্তি-বিবর্জিত সংসার যে সময়— "না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন"। সেই বিশৃঙ্খল পটভূমিকায় দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর আবির্ভাবের প্রধানত দুটি কারণ— অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ। ভূ-ভার হরণের জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব— এটি বহিরঙ্গ কথা। কেন-না "স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ" কিংবা "যুগধর্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম"। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"— আর স্বয়ং কৃষ্ণই চৈতন্য চন্দ্ররূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত। তাঁর ক্ষেত্রে — "আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ"। তখন গূঢ় কারণের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভূ-ভার হরণ ইত্যাদি কর্তব্যও জড়িত হয়। অতএব, চৈতন্যদেবের নামপ্রেম বিতরণের জন্য আবির্ভাব হল সামান্য বা বহিরঙ্গ কারণ। তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ হল— রাধাকৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদন।

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতি স্বরূপ; কৃষ্ণ স্বয়ং সচ্চিদানন্দময় ভগবান, রাধা তাঁরই হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা বিগ্রহ, অতএব তাঁরা একাত্ম। কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্যই তাঁরা দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তের মতে, রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় স্বরূপে বিলাসরস আস্বাদনের নিমিত্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এই লীলারস আস্বাদনের গূঢ় কারণটি ব্যক্ত করেছেন স্বরূপ দামোদর তাঁর শ্লোকে—"লোভাৎ"। অর্থাৎ, শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কীরূপ, শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদ্য কৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুরিমাই বা কীরূপ, কৃষ্ণকে অনুভব করে শ্রীরাধার সুখই বা কীরূপ— এরই লোভে শচীগর্ভরূপ-সিন্ধুতে রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই নিবিষ্ট; রাধিকা ও কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণের জন্য সতত চেষ্টিতা। তা সত্ত্বেও ব্রজে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের লীলারস-আস্বাদন তৃষ্ণা পূর্তিলাভ করেনি। মহাপ্রভুর আবির্ভাব সেকারণেই।

স্বয়ং সচ্চিদানন্দ রসঘনবিগ্রহ বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় সুখের জন্য তৃষ্ণা জাগে। চৈতন্যদেবে একাধারে এই বিষয় আশ্রয়ের সমাবেশ ঘটেছে।

কৃষ্ণের অদ্ভুত ও অনন্ত মাধুর্য আস্বাদ করে রাধার সুখের সীমা নেই। এই আপন মাধুর্য উপলব্ধির তৃষ্ণাতেই রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে চৈতন্য চন্দ্রোদয় হয়েছে নদীয়ায়। প্রেম-সেবনে গোপীগণের মধ্যে সর্বোত্তমা রাধিকার প্রেমের গূঢ়ত্ব ও গাঢ়ত্ব অনেক বেশি। রাধার সেই প্রেমসুখ-সেবনের তৃষ্ণায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। এছাড়াও তাঁর আবির্ভাবের গৌণ অন্তরঙ্গ কারণটি হল— অদ্বৈতের আকুল প্রার্থনা। ভক্তের ইচ্ছায় ধরাতলে অবতীর্ণ চৈতন্যচন্দ্ররূপী স্বয়ং কৃষ্ণ—"আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার। নাম বিনা কলিকালে ধর্ম নাহি আর।।"

কোন উপদেশের মাধ্যমে নয় , আপন জীবন সাধনার কষ্টিপাথরে মহাপ্রভু নাম-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকট করে তুলেছেন। জগতে বিলিয়েছেন দুর্লভ প্রেমধন।

প্রকটকালের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাল কাটত। রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভুর এই আর্তির চিত্র কবিরাজ গোস্বামী তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ গুলি কী কী ব্যক্ত করুন।

.....

.....

.....

২. মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য কারণটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

৩. একটি রৈখিক চিত্রের দ্বারা রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব এবং চৈতন্য তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিন।

.....

.....

.....

## ৩.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'গ্রন্থখানি চৈতন্য-জীবনী বিষয়ক বাংলায় রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইতিহাস, দর্শন,তত্ত্ব তো আছেই, এবং সর্বোপরি এটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যজীবনকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি এই গ্রন্থে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য বিভাগে আমরা এই গ্রন্থের তত্ত্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এই প্রসঙ্গে রয়েছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ।

ব্রজধামের লীলায় রসঘন আনন্দঘন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের নিষ্কৈতব নিরবদ্য প্রেমের প্রতিদান দিতে না পেরে ঋণী হয়েছিলেন। রসিকশেখর রসময়কলেবর শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনটি মুখ্য। ব্রজলীলায় তাঁর তিনটি বাঞ্ছা পূরণ হয়নি—

"কৈছন রাধা-প্রেমা কৈছন মাধুরিমা,

কৈছন সুখে তিহোঁ ভোর" —

এই তিন বাঞ্ছার পূর্তি না হওয়ায় এবং আশ্রয় জাতীয় ভাবের অঙ্গীকার বিনা বিষয়জাতীয় বস্তু তা আস্বাদন করতে পারেন না বলেই রসরাজ কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু হয়ে নদীয়ায় হলেন আবির্ভূত। ঋণী কৃষ্ণ নবদ্বীপে আসার

মুখ্য কারণটি হল— স্বমাধুর্য আস্বাদন, শ্রীরাধার প্রেম ও সুখের আস্বাদন এবং গৌণ কারণ হল— উদারবর্ষ হয়ে জগতকেও প্রেমময়, আনন্দময় করা।

"প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম।।"

ব্রজের কৃষ্ণ বিলাসী, কিন্তু নদীয়ার গৌর বিলাসী এবং বিরাগীও বটে। অন্তরে রসভাব-আস্বাদক হয়েও বাইরে হলেন সন্ন্যাসী, স্বয়ং ভগবান হয়েও ভক্তভাবে "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়", স্বয়ং রসরাজ-মহাভাব-মিলিত তনু হয়েও রসলোলুপ এবং ভাব তন্ময়, স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও রাধাভাবে বিভাবিত—

"কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়।" — বলে আর্তনাদ করেন।

ব্রজধামে কৃষ্ণ এবং রাধা একাত্মক হয়েও লীলারস-আস্বাদনের জন্য দ্বিধা বিভক্ত; আর নদীয়ায় পুনর্বার সেই 'একহি স্বরূপ' রূপে গৌরাঙ্গ অবতার। রস ও ভাবের পৃথক লীলাও যেমন নিত্য, একাত্মক লীলাও তেমনই নিত্য। রস আস্বাদনের বৈশিষ্ট্যে ব্রজলীলা এবং ভাবাস্বাদনের বৈশিষ্ট্যে নবদ্বীপলীলা। উভয় লীলাই নিত্য এবং সমাস্বাদনীয়— তত্ত্বত কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন হলেও লীলায় হলেন ভিন্ন। কলিযুগের অবতাররূপে মহাপ্রভু জগতকে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে অবগাহন করিয়েছেন; অশ্রুতচর প্রেম-পরমার্থ, অজ্ঞাতচর নাম-মহিমা, দুর্লভতর বৃন্দাবনমাধুরী-প্রবেশ এবং অননুভূতচর পরমাশ্চর্য মাধুর্য সীমা তাঁরই করুণায় অনুভূত হয়েছে।

## ৩.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

## ৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

## ৩.৮ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ- ৪
## চৈতন্যচরিতকাব্য
### চৈতন্যচরিতামৃত : সাধ্যসাধন-তত্ত্ব

**বিষয় বিন্যাস**

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মিলন বা সাধ্যসাধন তত্ত্ব

৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৪.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ৪.০ ভূমিকা (Introduction)

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত এক যুগান্তকারী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের মহান আধ্যাত্মিক জীবনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন সুমহান গ্রন্থ — 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

মহাপ্রভুর শেষ জীবনের লীলা বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া অন্য কোনো চৈতন্য-জীবনীকার মহাপ্রভুর জীবন-সায়াহ্নকালের বিস্তৃত পরিচয় দেননি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব। এই বিভাগে আমরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করব।

### ৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা আলোচনা করেছি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কৃষ্ণ-রাধা ও গৌরতত্ত্ব। এই বিভাগ থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

- দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের মিলন এবং রামানন্দ কথিত চৈতন্য-অনুমোদিত সাধ্য-সাধনতত্ত্ব।

## ৪.২ রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মিলন বা সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন রায় রামানন্দ। তিনি ছিলেন শুদ্র বর্ণের। কিন্তু স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন —

"রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র।"

রামানন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে —

"মাধব পুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্র পুরী।

তার শিষ্য রামানন্দ প্রেম অধিকারী।।"

স্বয়ং সিদ্ধান্ত সুধা সাগরস্বরূপ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তি সিদ্ধান্ত অর্থাৎ তাঁর সাধ্য-সাধনতত্ত্ব রায় রামানন্দের মুখে সঞ্চার করে স্বয়ংকৃত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, — সেটিই বৈষ্ণবের 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' নামে খ্যাত।

প্রথম সংস্কৃতি সম্পন্ন বাঙালি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে গোদাবরী নদীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলন এক অনাস্বাদিত পূর্ব মিলন। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে এই মিলন কাহিনি স্বর্ণাক্ষরে গাঁথা রয়েছে।

'সাধ্য বস্তু কী' — মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বলেছেন — "স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়।" গীতাতেও এই স্বধর্মাচরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু একে মেনে নিতে পারেননি —"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।" কারণ স্বধর্মাচরণে ভগবানের প্রতি কোনো প্রেম সম্পর্কই স্থাপিত হয় না। দ্বিতীয়ত, স্বধর্মাচরণের ফলে জীবের যে নিত্য স্বরূপ অর্থাৎ দাসত্ব তা প্রকাশিত হয় না। অতএব যে অনুষ্ঠান জীবের স্বরূপকে প্রকাশিত করে না তা কীভাবে জীবের সাধ্য হতে পারে। তাই মহাপ্রভুর কাছে তা 'এহো বাহ্য'।

শ্রীকৃষ্ণে কর্মার্পণকে যখন রায় রামানন্দ সর্বসাধ্য সার বলে স্বীকৃতি দিলেন তখন মহাপ্রভু বললেন — "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" কারণ কর্মার্পণের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একটি ক্ষীণ সম্পর্ক স্থাপিত হলেও এর মধ্যে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, জীবের স্বরূপ যে নিত্যদাসত্ব তাও প্রমাণিত হয় না। এতএব এই অনুষ্ঠানেও ভক্তি অধরাই থেকে যায়।

গীতায় বলা হয়েছে —

"যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

অর্থাৎ যা কিছু কর্মই করবে তার সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য একেও বলেছেন "এহো বাহ্য"।

রায় রামানন্দ যখন স্বধর্ম ত্যাগকেই ভক্তি সাধ্যসার বলে উল্লেখ করলেন তখনও মহাপ্রভু "এহো বাহ্য আগে কহ আর" বলে মত প্রকাশ করেছেন। স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ ইত্যাদির তুলনায় স্বধর্ম ত্যাগের অবশ্যই একটি ইতিবাচক দিক আছে। কেন-না, স্বধর্ম ত্যাগের মধ্য দিয়ে একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু মনে

রাখা প্রয়োজন, ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এলেও তা কোনো সম্পর্কান্বিতা নয়। তা বৈষ্ণবের শান্তরস পর্যন্ত এগোতে পারে, তার অধিক নয়।

এরপর রায় রামানন্দ বললেন — "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-সাধ্য-সার।"

"যিনি শুদ্ধজীবাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মভূত অতএব প্রসন্নচিত্ত হয়েছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, পরন্তু সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে পরমভক্তি লাভ করেন। এই হচ্ছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির লক্ষণ। এর উত্তরেও প্রভু বলেন — "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যেহেতু সুখ ও দুঃখ বাস্তব নয়, এই ভক্তিতে দুঃখ নিবারণে তাই তাৎপর্য না থাকলেও জ্ঞানের আবরণ থাকায় তা উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হয় না। এই ভক্তিতে জ্ঞানই প্রধান হয়ে ভক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা ভক্তির ফল মোক্ষ সাধন করতে পারলেও ভগবৎ সাক্ষাৎকার দ্বারা প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করতে পারে না। তাই প্রভুর কাছে 'এহো বাহ্য'।

জ্ঞান হচ্ছে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ প্রতীতি। অর্থাৎ এতে জীবের যে স্বরূপ নিত্যদাসত্ব, তাকে নাকচ করে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাচ্ছে, যা সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব মত বিরুদ্ধ। জীবের এই ব্রহ্মস্বরূপ ভাব ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি, ভজনা ইত্যাদিকে ব্যবহারিক সত্য বলে অস্বীকার করেছে। এছাড়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, ঈশ্বরও এই মতবাদে অস্বীকৃত। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য তাঁর 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে জীবের আত্মস্বরূপ সন্ধানকে অর্থাৎ জীব যে স্বয়ং ব্রহ্ম এই স্বরূপের অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে উল্লেখ করেছেন, যা বৈষ্ণব মতে 'এহো বাহ্য'। কারণ "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। সেজন্যই মহাপ্রভু এই মতকে স্বীকার করতে পারেননি।

এরপর রামানন্দ যখন বললেন — "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য যার" তখন মহাপ্রভু "এহো হয়" বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যদিও একে সর্বসাধ্যসার বলে গ্রহণ করেননি। কেন না জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রণামের মধ্য দিয়ে জীবের দাস-স্বরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও এই প্রণামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এবং ভক্তের সম্পর্ক প্রেমান্বিত হয়নি। তাই মহাপ্রভু একে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেননি । এরপর রায় রামানন্দ যখন প্রেম ভক্তিকেই "সর্ব্বসাধ্যসার"বলে উল্লেখ করলেন, তখন মহাপ্রভু এই মতকে "এহো হয়" বলে স্বীকৃতি দিলেও শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিলেন না। কারণ প্রেম ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি নিত্যদাস জীবের প্রেম সম্পর্ক স্বীকৃতি পেলেও তা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য আদি কোনো বিশেষ সম্পর্কে অন্বিত হয়নি। প্রেম বিশেষ সম্পর্কান্বিত হলেই তা গাঢ়তা লাভ করে এবং রাগের উৎকর্ষ ঘটে।

অতঃপর রায় রামানন্দ দাস্য প্রেমকেই "সর্ব্বসাধ্যসার" বলে উল্লেখ করলেন। মহাপ্রভু একেও "এহো হয়" বলেছেন। এই দাস্য প্রেমে জীবের যে নিত্যস্বরূপ সেই নিত্যদাসত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ঈশ্বরের প্রতি জীবের সম্পর্ক দাস্যপ্রেমে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু মহাপ্রভু এই প্রেমকেও সাধ্য শিরোমণি বলে স্বীকার করতে না পারার কারণ হল— এই প্রেম সম্পর্কানুগা। ঈশ্বরের প্রতি দাস জীবের প্রেমের সম্পর্ক দাস সম্পর্কের দ্বারা অন্বিত হয়েছে। অতএব ঈশ্বরের কাছে জীবের পুরোপুরি আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না। কেন

না, জীবের 'আমি দাস' এই অহং ভাবটুকু শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, তাই ঈশ্বরের দিক থেকে পুরোপুরি বশীভূত হওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া এই প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা থাকলেও সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের লাল্য-পাল্য ভাব এতে থাকে না।শেষ পর্যন্ত প্রভুর প্রতি দাসের একটি সম্ভ্রমবোধ থেকে যায়। সম্ভ্রমবোধ এই প্রেমের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর রামানন্দ বলেছেন — "সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" মহাপ্রভু বললেন "এহোত্তম"। কিন্তু তাকে তিনি সাধ্য শিরোমণি বলতে পারেননি । কারণ সখ্যপ্রেমে বৈষ্ণব্যের 'সাধনতত্ত্ব' তুলনায় গাঢ়তা পেলেও তা সান্দ্রতম প্রেম সম্পর্কের মধ্যে বাধা পড়েনি। কেননা এতে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবার সঙ্গে বিশ্বাস যুক্ত হলেও তাতে বাৎসল্যের লাল্যপাল্য এবং মধুরের আত্মসমর্পণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এই প্রেম সম্পর্কানুগা মাত্র। সুতরাং এখানেও সম্পর্কের হাত ধরে জীবের অহং ভাব পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সেজন্যই মহাপ্রভু এই প্রেম হতেও উৎকৃষ্ট কোনো প্রেমের সন্ধান জানতে চেয়েছেন।

এর উত্তরে রামানন্দ বলেছেন — "বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার" । প্রভু তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রেমের কথা জানতে চেয়েছেন। এই বাৎসল্য প্রেমকে প্রভু উত্তম বলেছেন, কিন্তু সর্ব্বোত্তম বলেননি। কারণ বাৎসল্য প্রেমে সন্তানের প্রতি সেবা ভাবের মধ্য দিয়ে তার প্রতিপালকের যে অহং ভাব তাই ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ঘটতে দেয় না। সুতরাং এই প্রেম সম্পূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছায় মণ্ডিত হতে পারে না। লালন পালনের আনন্দ সুখের মাধ্যমে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার শেষ অবশেষটুকু থেকে যায়। দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রেমে জীবের পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে না এবং সম্পর্কানুগা প্রেমের হাত ধরে অহংটুকু তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে বলেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ বশীকরণ এই সকল প্রেমে সম্ভব হয় না।

রামানন্দ তখন উচ্চারণ করলেন সেই মহাবাণী — "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"। এর উত্তরে প্রীত প্রভু বললেন "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়"।

কারণ, কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের লালন-পালন ও মমত্ববোধ ছাড়াও অতিরিক্ত রয়েছে কৃষ্ণ সুখের জন্য ঐকান্তিক সেবা। কান্তাপ্রেমে কান্ত-কান্তা ,সম্বন্ধটি থাকলেও এই প্রেমে সেবা বাসনা সম্বন্ধের অনুগত নয়। এই সম্বন্ধে আছে যেমন করেই হোক , এমনকি নিজ অঙ্গ দিয়ে সেবা করেও শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার একান্ত বাসনা।

এই কান্তা প্রেমই সেবা বাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । কারণ রাসস্থলীতে লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অহৈতুকী নিষ্কৈতব প্রেমের প্রতিদানে আমি অসমর্থ— অর্থাৎ 'আমি পারি না'। কৃষ্ণকে বশীভূত করার জন্য কান্তা প্রেম সমর্থা —

"এই প্রেম-অনুরূপ না পারে ভজিতে।

অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে।।"

মথুরায় কংসারি শক্তিমান কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ, দ্বারকায় ঐশ্বর্যবান রাজা কৃষ্ণ হলেন

পূর্ণতর, কিন্তু গোকুলের রাসলীলাংশে অহৈতুকী প্রেমের প্রতিদানে অসমর্থ কৃষ্ণ হলেন পূর্ণতম! —

"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তভূত গোকুলান্তরে।

পূর্ণতা পূর্ণতরতা মথুরা দ্বারকাদিষুচ।।"

সেজন্যই — "যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে" — এই বাণী গোকুলে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় — অহৈতুকী প্রেমের প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে হয় — "ন পারয়েহহং"।

কৃষ্ণ স্বয়ং সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, নিত্যপূর্ণ। কিন্তু গোপীপ্রেমের আলোকে তিনি আরো বেশি উজ্জ্বল, পূর্ণতম হয়ে ওঠেন। এই কান্তা প্রেমকে "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়"জেনেও যখন প্রভু আরো শুনতে চাইলেন, তখন রামানন্দ বলেন —

"ইহার আগে পুছে হেন জনে।

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।।"

তবু কৌতুহলের অবসান ঘটাতে হয়। তাই রামানন্দ বলেন —

"ইহার মধ্যে রাধা-প্রেম সাধ্য শিরোমণি।

যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।।"

রায় রামানন্দের মুখে অমৃত নিষ্যন্দী বাণী শুনে প্রভুর কৌতুহল আরো বাড়ে। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব ইত্যাদি রামানন্দের মুখ থেকে শোনার অভিলাষী হন।

সাধারণ ব্রজদেবীদের প্রেম থেকে শ্রীরাধাপ্রেমের উৎকর্ষ অধিক। সাধারণ ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন, কিন্তু রাধা তেমন বিভোর হতে পারেননি, তিনি দেখলেন প্রত্যেক গোপীর পাশেই এক কৃষ্ণ আছেন, অনুরূপ ভাবে তাঁর পাশেও রয়েছেন কৃষ্ণ। এই দেখে মানিনী রাধা রাস ছেড়ে চলে যান। ফলে কৃষ্ণও রাধাকে অনুসরণ করে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করেন।

অসাধারণ মাধুর্যের আধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি অনাদি অনন্ত পুরুষ। তিনি কারণ সকলেরও কারণ। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি সর্বরস পূর্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন। সকলের তিনি মূলাধার। শাস্ত্রকারগণ তাঁকে কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা উপাসনার বিধান করেছেন। তিনি নিখিলের চিত্তহারী। সকল রসের তিনি বিষয় ও আশ্রয়। তিনি শৃঙ্গার রসরাজ। তিনি আত্মকাম। এই যাঁর মধ্যে তাঁর মধ্যেও অপূর্ণতা —

"আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।

আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।।"

তাই তিনি 'দুই ' হয়েছেন।

বিষ্ণুর তিনটি শক্তি — পরা (স্বরূপ), ক্ষেত্র (তটস্থা) এবং অবিদ্যা (মায়া)। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়। তাঁর স্বরূপ শক্তিও তিন প্রকার — সদংশে সন্ধিনী, চিদাংশে সংবিৎ

এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী।

হ্লাদিনী কৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান করে। এই হ্লাদিনীর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সুখ আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা নিজানন্দ অনুভব করেন।

শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব প্রণয় মাধুরী, সেখানে ভক্ত প্রবেশ করতে পারে না। তাই ভক্ত আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ দুই হয়ে এলেন রাধারূপে।

শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার রসরাজ। নিখিল বিশ্বের চিত্তহরণকারী তিনি। তাঁর নিজের মাধুর্য নিজের চিত্তকেও আকর্ষণ করে।—

"আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।

আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।।"

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও আপন আনন্দ অধিষ্ঠাত্রী হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা নিজানন্দ অনুভব করেন। এই হ্লাদিনীর সারাংশ প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের পরম সার মহাভাব। শ্রীরাধা হলেন এই মহাভাব - স্বরূপিণী। সর্বগুণ সম্পন্না এবং সমর্থা রতি জাত শ্রীরাধার প্রেম। তাই তিনি শীর্ষস্থানীয়া। তিনি কান্তাবর্গের অংশিনী, অতএব শ্রেষ্ঠ। তিনি চিন্তামণি সার, শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণই তাঁর কার্য। লক্ষ্মীগণ তাঁর বিলাসমূর্তি, মহিষীগণ তাঁর প্রতিবিম্ব, ললিতাদি গোপিগণ তাঁর কায়ব্যূহ। ব্রজধামে নানা ভাবভেদে ও রসভেদে নানা মূর্তি ধারণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করান। রাধা কৃষ্ণময়ী, অন্তরে বাহিরে তাঁর কৃষ্ণ বিরাজ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময়, রাধা প্রেমরসময়ী কৃষ্ণ শক্তি, অতএব কৃষ্ণাভিন্না। তিনি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী, সর্ব সৌন্দর্যের গুণাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ববাঞ্ছার আশ্রয়। তিনি জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মোহিনী। তাই তিনি মহাভাব স্বরূপিণী। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানে কোনো ভেদ নেই। তাই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্ম, লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত কেবল রূপভেদ মাত্র —

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একহি স্বরূপ।

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।"

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ ঘন আনন্দাধিষ্ঠাত্রী মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার দেহ কৃষ্ণপ্রেমময় ও তাদৃশ প্রেম দ্বারা বিভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ রাধার দেহের সুগন্ধি, লজ্জা তাঁর শ্যামবসন, কৃষ্ণানুরাগ তাঁর রক্তবর্ণ উত্তরীয়, প্রণয়মান তাঁর কঞ্চুলিকা, রূপ সৌন্দর্য তাঁর কুঙ্কুম, সখীপ্রণয়রূপ চন্দন , স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর তাঁর অঙ্গের বিলেপন। শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ, প্রচ্ছন্নমানরূপ কুটিল কেশ বিন্যাস, ধীরাধীরাত্মরূপ গুণ অঙ্গের পট্টবাস, রাগ হল তাম্বুলরাগ, প্রেমকৌটিল্য নয়নের কাজল। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, যশ রাধার কর্ণ ভূষণ। কৃষ্ণকে সর্বদাই তিনি মধুর রূপরস মধুপান করিয়ে কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর ও অনুপম গুণ দ্বারা পূর্ণ কলেবর। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁর গুণগানের পার পান না।

'লোভাৎ' যিনি নব কলেবরে এসেছেন ধরাধামে, রামানন্দ রায়ের মুখ নিঃসৃত অপরূপ তত্ত্বকথা তাঁর লোভকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তিনি রামানন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিলাস মহত্ত্ব শুনতে চাইলে রামানন্দ বলেন —

শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ, কেলিনিপুণ ও ধীর ললিতাখ্য নায়ক। নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁর কাজ। তাই রাধার সঙ্গে কুঞ্জবনবিহারী তিনি। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমবিলাস প্রভুর কৌতুহলকে আরো বাড়িয়ে তুললে রামানন্দ প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের কথা শোনান।

মধুর রসের ঘনীভূত রূপ হচ্ছে প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত। তা কান্তাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। সাধ্য শিরোমণি মধুর রসের পরাকাষ্ঠা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত। কান্তাপ্রেমে নায়ক ও নায়িকার উভয়েরই প্রয়োজন কিন্তু প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে এই দুই প্রেমের সান্দ্রতা হেতু আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যায়। তখন রমণ ও রমণী — এই পার্থক্য থাকে না। রামরায়ের উপলব্ধিতে এই অনুভব পরাকাষ্ঠা পেয়েছে তাঁর স্বরচিত একটি গীতে —

"না সো রমণ না হাম রমণী"।

চতুর এবং নিবেদিত প্রাণ ভক্তের হাতে দ্বিতীয়বার ধরা পড়ে —

"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল"। প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের শেষ অবধি জেনে প্রেমে বিভোর হয়ে প্রভু নীরব গভীরতাকে অনুভব করতে চেয়েছেন রামানন্দের মুখে হাত দিয়ে। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ স্বরূপই হল প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। কেননা রসরাজ নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধা -- এই দুইয়ের ঘনীভূত বিগ্রহই হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। বৃন্দাবনের যমুনা তীরের সেই তীব্র প্রেমবাঞ্ছা বিলাসজনিত সান্দ্রতা হেতু মহাপ্রভুতে চরম বিবর্তের সৃষ্টি করেছে — "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ স্বরূপই হচ্ছে কান্তাপ্রেমের শেষ অবধি-প্রেমবিলাসবিবর্তের পরাকাষ্ঠা। সেজন্যই সেই আত্মস্বরূপ ধরা পড়েছে বলে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করেছেন। এই সাধ্যবস্তু লাভের একমাত্র সাধন উপায় হল — সখীর অনুগত হয়ে রাগানুগা মার্গে এই মধুর রস আস্বাদন করা। সরাসরি এই প্রেম আস্বাদন করা যায় না। সখি বিনা এই লীলা পুষ্ট হয় না, আবার সখি বিনা অন্যের এই লীলায় প্রবেশই হয় না। নরোত্তম দাসের ভাষায় —

"সখীর অনুগা হৈয়া ব্রজসিদ্ধ দেহ পাইয়া" — এই লীলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। নিত্যদাস জীবের এ হচ্ছে পরোক্ষ সম্ভোগ। তাই জীবের একমাত্র কামনা —

"ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব দোঁহার গলে।।"

যিনি সখীভাবে সখীর অনুগত হয়ে ভজন করেন, তিনিই রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ করেন।

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন"— তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজ লীলায় মন নেই। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার লীলা করিয়ে যে সুখ লাভ করেন তা নিজ লীলার সুখ থেকেও কোটিগুণ অধিক। শ্রীরাধা প্রেম কল্পলতা স্বরূপ আর সখীগণ তাঁর পল্লব, পুষ্প ও পাতা।

মহত্ত্বের সীমান্ত প্রাপ্ত গোপীপ্রেম স্বভাবত অপ্রাকৃত হলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সঙ্গে সাম্য বশতই গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তারে কহি কাম নাম।।"

বস্তুত কামের নিজেন্দ্রিয় সুখেই তাৎপর্য আর গোপীপ্রেমের কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখেই তাৎপর্য। গোপীরা কৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছার নিমিত্তই তাঁর সঙ্গে বিহার করে থাকেন। এইরূপ গোপী ভাবামৃতে যাঁর লোভ হয় তিনি লোকধর্ম ও বেদধর্ম ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করে থাকেন। যিনি রাগানুগা মার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

বিধিমার্গে ভজন করে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দনকে লাভ করা যায় না। অতএব, যিনি গোপীভাব অঙ্গীকারপূর্বক অহোরাত্র শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন, যিনি নিজের ভাবনায় গোপীদেহে অবস্থিত হয়ে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই সখিভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ লাভ করে থাকেন। গোপীর অনুগতি ব্যতিরেকে কেবল ঐশ্বর্য জ্ঞানে ভজন করলে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।

গোদীবরী তটে চৈতন্যের বিনীত কৌতুহলের উত্তরে ভক্ত শ্রেষ্ঠ রামানন্দ নিবেদন করেছেন বৈষ্ণবের এই সর্বসাধ্যসার তত্ত্বকে । চৈতন্যের নিরন্তর প্রশ্ন এবং তদুত্তরে রামানন্দের শাস্ত্রীয় নিবেদন এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে সাহায্য করেছিল। গোদাবরী তটে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রামানন্দের সাক্ষাৎকাল পর্বেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈষ্ণবের ইতিহাসে এটি এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

আমরা "সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব" বিষয়ক এই দীর্ঘ আলোচনায় রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর আলোচনাকালে সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয়, শ্রীরাধার প্রেমের স্বরূপ, রাসলীলাংশে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত, সাধনতত্ত্ব নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে যদি কেবলমাত্র সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব আলোচনা করতে হয় তাহলে সাধ্যতত্ত্বের জন্য আলোচনার শুরু থেকে—

"এই প্রেম-অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে।।"

—এই উক্তি পর্যন্ত উল্লেখ করতে হবে, এবং সাধনতত্ত্বের আলোচনার জন্য এই আলোচনার — "এই সাধ্য বস্তু লাভের একমাত্র উপায় হল সখীর অনুগত হয়ে ... ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না"। — অংশটি অনুধাবন করতে হবে।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. রায় রামানন্দের পরিচয় দিন।

.....

.....

২. জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে রায় রামানন্দ সাধ্যসার বললে মহাপ্রভু তাকে 'এহো বাহ্য' বলেছেন কেন?

.....

.....

৩. জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে মহাপ্রভু স্বীকৃতি দিলেও তাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেননি কেন আলোচনা করুন।

.....

.....

৪. সখ্য প্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলেছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বলেননি কেন?

.....

.....

৫. বাৎসল্য প্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলে স্বীকৃতি দিলেও তাকে সাধ্য-শিরোমণি বলে স্বীকৃতি দেননি কেন?

.....

.....

৬. কান্তা প্রেমকে মহাপ্রভু 'সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়' বলে স্বীকৃতি দিলেন কেন আলোচনা করুন।

.....

.....

৭. " ইহার মধ্যে রাধা-প্রেম সাধ্য শিরোমণি"—ভাবার্থ লিখুন।

.....

.....

৮. সংক্ষেপে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

.....

.....

৯. 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

.....

.....

১০. কৃষ্ণপ্রেম সাধনার উপায় কী?

.....

.....

১১. রামানন্দের মুখে "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ" ইত্যাদি গীতাটি শুনে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখাচ্ছাদন করেছেন কেন?

.....

.....

## ৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

মহাপ্রভুর শেষ জীবনের লীলা বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া অন্য কোনো চৈতন্য জীবনীকার মহাপ্রভুর জীবন সায়াহ্ন-কালের বিস্তৃত পরিচয় দেননি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

সাধ্য বস্তু অর্থে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই সে চরম ও পরম সাধ্যবস্তু। রামানন্দের আলোচনায় তা প্রকাশ পায়। এই প্রেম আসলে প্রেমভক্তি।

রামানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচনা কালে প্রথমেই চূড়ান্ত তত্ত্বটি না বলে একেবারে মূল থেকে আরম্ভ করেছেন। মহাপ্রভু নেতির পথ ধরে আলোচনা করে গিয়ে পৌঁছেছেন সাধ্য তত্ত্বের একেবারে চূড়ান্ত অভিব্যক্তিতে।

রামানন্দ শুরু করেছিলেন "স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়" থেকে। স্বধর্মাচরণ ভক্তি না হলেও বিষ্ণু আরাধনার হেতু বলে তাতে ভক্তির আরোপ করা হয়। কিন্তু এই বিধিমার্গের ধর্মাচরণ বহিরঙ্গ ব্যাপার বলে মহাপ্রভু তাকে 'এহো বাহ্য' বলেছেন। এরপর ক্রমে "কৃষ্ণে কর্মার্পণ", "স্বধর্ম ত্যাগ", "জ্ঞান শূন্যা ভক্তি"কে "সর্বসাধ্যসার" বলেছেন রামানন্দ। "জ্ঞান শূন্যা ভক্তিকে" স্বীকার করেও মহাপ্রভু প্রেমভক্তির আরো উৎকর্ষ পন্থা জানতে চান। রামানন্দ একাদিক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমকে 'সাধ্যসার' বললে মহাপ্রভু সখ্য বাৎসল্য ও মধুর প্রেমকে উত্তম বলেছেন এবং এর অতিরিক্ত কিছু জানতে চাইলে রামানন্দ বলেন— "কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার"। এরপর রামানন্দ গোপীতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্ত পর্যন্ত আলোচনা করেন। তাঁর শেষ রায় হল— "ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি" তখন মহাপ্রভু তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন— "সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।"

অতঃপর মহাপ্রভু সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।

কৃপা করি কহ দেখি পাবার উপায়।।"

এ সাধন জীবের প্রয়োজনে। জীবের পক্ষে গোপীদের অনুগত সাধনে কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ সম্ভব। এভাবেই গোদাবরী তীরে মহা প্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

## ৪.৪. প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

## ৪.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

## ৪.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ- ৫
## চৈতন্যচরিত কাব্য
## চৈতন্যচরিতামৃত : বেদান্ত বিচার

**বিষয় বিন্যাস**

৫.০ ভূমিকা (Introduction)
৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৫.২ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ এবং বেদান্ত বিচার
৫.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৫.৪ সংক্ষিপ্ত টীকা (Summing Up)
৫.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৫.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ৫.০ ভূমিকা (Introduction)

"নাম সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরি পরম্।।"

প্রেম শব্দটি সাগর -তরঙ্গের মতো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত। সেজন্যই প্রেমকে বলা হয় 'অমৃত-সমুদ্র'। কামনা-মালিন্য-মুক্ত এই ভালোবাসাই যখন ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ঈশ্বর প্রেম। আবার এই ভালেবাসাই যখন মানুহের জন্য দেখা দেয়, তখন তাকে বলা হয় মানব-প্রীতি। এই মানব-প্রীতি তখনই সম্ভব এবং সম্পূর্ণ হয় যদি শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই প্রেম দেখা দিয়েছিল শ্রীব্রজধামের ধূলায়-ধূলায় ঘাসে ঘাসে। আর কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই মহানাম ও মহাপ্রেম বিলিয়েছেন ঘরে-ঘরে নরে-নরে।

মধ্যযুগের এক ক্রান্তিকালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, জাতীয় জীবনে তখন এক সঙ্কটময় সন্ধিলগ্ন। তুর্কী আক্রমণের কালে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি তখন ছিন্ন-ভিন্ন। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে কুসংস্কার ও জাত-পাতের ভেদাভেদ যেদিন মানুষের মধ্যে এক কলঙ্কময় বিভাজনরেখা অঙ্কন করেছিল। দেশব্যাপী অরাজকতা, পারম্পারিক বিভেদ ও হানাহানি বাঙালি জাতিকে তখন সংশয়ের ঘনান্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল। দেশের এই রাজনৈতিক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ললাটে বিশ্ববিজয়ের জয়টীকা ধারণ করে দুর্জয় দৃপ্ত প্রাণের স্পন্দনকে জাগিয়ে তুললেন মহাপ্রভু। এতদিনের আচার-বিচার-সংস্কার-বিভেদের মহাক্ষেত্রে তিনিই প্রথম নতুন মানসিকতা ও মানবিকতার জয়ধ্বজা প্রোথিত করলেন— সেই জয়ধ্বজায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত ছিল সেই মহাবাণী -" চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" তাঁর আবির্ভাব কেবল যে ধর্ম-

দর্শনের জগতে নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বারকে উন্মোচিত করেছে, তাই নয়, তাঁর আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক মহা-সংঘটন রূপে পরিগণিত হয়েছে।

কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ও ব্রজের অহৈতুকী প্রেম বিতরণ— এই ছিল এই নিঃস্ব সন্ন্যাসীর পরম ধন। আর এই সম্পকেই তিনি দেশব্যাপী মহা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। মহাপ্রভুর এই আন্দোলন বাঙালি জাতিকে শুধু ভক্তিরসের উত্তাল তরঙ্গে আত্মহারা করেনি, বাঙালি জাতির বৌদ্ধিক চেতনাকেও অসাধারণভাবে উজ্জীবিত করেছিল। বস্তুত মহাপ্রভুকে কেন্দ্রে রেখেই শ্রীজীব গোস্বামী রচনা করেছিলেন তাঁর 'ষট্-সন্দর্ভ', চৈতন্য-আনীত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলদেব বিদ্যাভূষণ রচনা করেছিলেন প্রস্থান-ত্রয়ীর দার্শনিক টীকা 'গোবিন্দ-ভাষ্য'। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত নবপ্রেমধর্মের অমৃতস্পর্শ একাদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু মৃতপ্রায় জাতিকে নবজীবনের উন্মাদনা দান করেছিল,অন্যদিকে বাঙালির চিন্তায়, মনন-কল্পনায়, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্য সাধনায় নবজাগরণের আশ্বাস বহন করে এনেছিল। তাঁর প্রচারিত উদারনৈতিক কৃষ্ণপ্রেমকথা তথাকথিত আচার-সর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠানকে নস্যাৎ করে মানব ধর্মের জয়কেতনকে প্রোথিত করেছে। তাঁর গৈরিক উত্তরীয় মানব-প্রেমের অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত-মুর্খ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে প্রেম ভক্তি বিলিয়েছেন মহাপ্রভু। তাঁর জীবনাদর্শের স্পর্শ তৎকালীন বাঙালি সমাজ-মানস তথা সাহিত্যকে আপন গৌরবে লালিতও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আশ্চর্য এই যে, বাংলাদেশও বাঙালি জীবনে তাঁর এমন সর্বব্যাপী প্রভাবের সূত্রটি কেবলমাত্র তাঁর জীবনাদর্শের পত্র পুটেই লালিত হয়েছিল। আপন জীবনাচরণের দ্বারাই তিনি নিজেকে মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থাপিত করে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি জাতীয় জীবনে এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্য নামসংকীর্তন— মূলত এই ত্রিবিধ আদর্শের উপরই মহাপ্রভুর ধর্ম- সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রবর্তিত একত্বের মহামন্ত্র, প্রেমধর্মও সাম্যবাদ বাঙালির মনকে চিরাচরিত পথের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। তিনি প্রেমের মহামন্ত্রে জাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির যে পথনির্দেশ করেছিলেন, তাতে জীবে দয়া, কৃষ্ণপ্রেম, নামধর্ম ও নামসংকীর্তন, নাম ও নামীর ঐকাত্মিকতাই ছিল মূল কথা।

অগাধ পাণ্ডিত্যর অধিকারী হয়েও মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর নিজের জীবন, জীবনাচরণ, তাঁর কর্মই যেন বহু অধ্যায়-বিশিষ্ট একখানি মহাগ্রন্থ। কেবল ক্ষেত্রবিশেষে উপদেশের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যেমেই তিনি নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর জীবনই তাঁর মহাবাণী— "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" ভুল ভেবেছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। পুরীর মন্দিরে হতচেতন তরুণ সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে দেখে ভেবেছিলেন, এই নবযুবা সন্ন্যাসী বুঝি বা আজীবন সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করতে পারবেন না। তাই বেদান্ত ভাষ্য শুনিয়ে অদ্বৈত-বৈরাগ্যমার্গে তাঁকে প্রবেশ করানোর পরিকল্পনা করতে গিয়েই ভুল ভেঙেছিল সার্বভৌমের। সাতটি দিন ধরে যে সন্ন্যাসী নির্বাক শ্রোতা হয়ে কেবল তাঁর ভাষ্য শুনেছিলেন, সার্বভৌমের প্রশ্নে তাঁর অমৃত-নিষ্যন্দি কণ্ঠে বেজে উঠল মধুর প্রেমামৃতের কথা। শেষ পর্যন্ত আত্মসমপর্ণ করলেন সার্বভৌম এই অনিন্দ্য কান্তি তরুণ সন্ন্যাসীর প্রেমধর্মের কাছে। 'মুক্তি' নয়, 'ভক্তি'-কেই শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করে ঘোর মায়াবাদী সার্বভৌম মহাপ্রভুর প্রেমমন্ত্রে

দীক্ষিত হলেন। বস্তুত মহাপ্রভু কর্তৃক অদ্বৈতবাদী সার্বভৌমের সঙ্গে যে বেদান্তবিচার, তা শঙ্করাচার্যর অদ্বৈতবাদকে ভাবপ্রাবল্যে নয়, দার্শনিক যুক্তির বাণাঘাতে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে বাঙালির দার্শনিক চিন্তাকে উদ্বোধিত করতে সাহায্য করেছিল। অদ্বৈতমার্গের ধারণায় জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে যে একটি নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছিল, মহাপ্রভুর প্রবল সদর্থক যুক্তির দ্বারা যেই ধারণা অপসারিত হয়ে ষড়ৈশ্বর্যশালী সচ্চিদানন্দময় ভগবানের মধুর রূপের প্রতিষ্ঠা হল ভক্তের হৃদি-মন্দিরে।

## ৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা আলোচনা করেছি — দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের মিলন এবং রামানন্দ কথিত চৈতন্য-অনুমোদিত সাধ্য-সাধনতত্ত্ব। এখন এই বিভাগ থেকে আপনারা জানতে পারবেন —

- সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার প্রসঙ্গ ও সার্বভৌমের উদ্ধারের কাহিনি।

## ৫.২ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ এবং বেদান্ত বিচার

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাতের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

সঙ্গীদের পেছনে ফেলে মহাপ্রভু পুরাধামে এলেন। জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে মহাপ্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বিগ্রহকে আলিঙ্গন করার জন্যে ধাবিত হলেন, পরক্ষণেই প্রেমবিষ্ট মহাপ্রভু মন্দিরে অচেতন হয়ে ঢলে পড়েন। দৈবকৃপায় সার্বভৌম ভট্টাচার্য তা দেখতে পান এবং মহাপ্রভুকে ধরে ফেলেন। তরুণ সন্ন্যাসীরূপী মহাপ্রভুর সৌন্দর্য ও প্রেমের বিকার দেখে সার্বভৌম বিস্মিত হন এবং তাকে নিজগৃহে এনে শুইয়ে রাখেন। মহাপ্রভুর খোঁজেগোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে নিত্যনন্দ, মুকুন্দ-আদি শিষ্যগণ সার্বভৌমের গৃহে এলে সার্বভৌম মহাপ্রভুর পরিচয় জানতে পারেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে আসে। আচার্য গোপীনাথের কাছে সার্বভৌম জানতে পারেন মহাপ্রভুর গুরুর কথা। মহাপ্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি এবং প্রৌঢ়-যৌবন দেখে সার্বভৌম চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, এই নবীন সন্ন্যাসী শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করাত পারবেন কি এঁর সন্ন্যাসধর্ম রক্ষার উপায় হিসেবে সার্বভৌম ভাবলেন যে, এই তরুণ সন্ন্যাসীকে তিনি বেদান্ত শ্রবণ করাবেন এবং বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাবেন —

"নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব।।"

এই অভিপ্রায়ে সার্বভৌম তাঁকে একনাগাড়ে সাতদিন ধরে বেদান্ত শ্রবণ করান।

এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখযোগ্য, সার্বভৌম মহাপ্রভুকে যে বেদান্ত-ভাষ্য শ্রবণ

করিয়েছেন, তা হল শঙ্করাচার্য-কৃত বেদান্ত-ভাষ্য। এই বেদান্ত-ভাষ্য আসলে উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র— এই প্রস্থান -ত্রয়ীর শঙ্করাচার্য-কৃত অদ্বৈতমার্গীয় বা জ্ঞানমার্গীয় বা মায়াবাদী ভাষ্য। এই ভাষ্যের মূল কথা হল— "ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। — অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই চরাচর জগৎ হল মিথ্যা তথা মায়িক এবং জীব হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্ম। প্রখর তার্কিক পণ্ডিত ও যুক্তিবাদী বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন মায়াবাদী এবং জ্ঞানমার্গে বিশ্বাসী।

সেই জ্ঞানমার্গ- অবলম্বনেই তিনি মহাপ্রভুকে সাতদিন ধরে বেদান্ত ভাষ্য ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন। সার্বভৌমের ব্যাখ্যা-কালে মহাপ্রভু ছিলেন নির্বাক শ্রোতা। অষ্টম দিনে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বললেন—

"সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।।
ভাল-মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুল কিনা বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি।।"

উত্তরে মহাপ্রভু বললেন—

" ... মুর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ।।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি।।"

মহাপ্রভুর কথায় সার্বভৌম আশ্চর্য হয়ে বললেন যে, যে বুঝতে পারে না, সেতো বোঝার জন্য দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে, কিন্তু মহাপ্রভু সেই ক্ষেত্রে মৌন কেন! মহাপ্রভু উত্তর দেন—

"... সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।।
সূত্রের যে অর্থভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।।"

সার্বভৌমকে হতবাক্ করে এইবার শুরু হয় মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম দার্শনিক ভাবনা রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী- রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে চৌদ্দ অক্ষরের পায়ার ছন্দে। এর থেকেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব— যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের একটি নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

মহাপ্রভুর মতে সূত্রের অর্থ নির্মল এবং ভাষ্যে সেই অর্থ স্পষ্ট প্রকাশিত। কিন্তু সার্বভৌম সেই অর্থকে জটিল করে তার আসল অর্থকে ঢেকে ফেলেছেন। উপরন্তু সার্বভৌম

সূত্রের যে অর্থ করেছেন তা স্বকপোলকল্পিত অর্থ মাত্র।

অর্থ তিন প্রকার— অভিধার্থ, লক্ষণার্থ এবং ব্যঞ্জনার্থ। যেখানে শব্দর অর্থ সোজাসুজি ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাকেই বলে অভিধার্থ; আর অর্থ যেখানে সোজা পথ অবলম্বন না করে জটিল পথ ধরে অর্থাৎ সরাসরি অর্থ প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শব্দ যখন লক্ষণ মিলিয়ে অন্য অর্থে প্রকাশিত হয় তাকেই বলে লক্ষণার্থ। অর্থাৎ অভিধার্থ হল শব্দের মুখ্যার্থ আর লক্ষণার্থ বল শব্দের গৌনার্থ।

মহাপ্রভুর অভিমত হল, ব্যাসসূত্র বেদের মুখ্য অর্থকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সার্বভৌম শঙ্করাচার্য- কৃত অদ্বৈতবাদী ভাষ্য-অনুযায়ী সেই মুখ্যার্থকে অতিক্রম করে তার গৌণার্থকে গ্রহণ করেছেন।

মহাপ্রভুর মতে প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হল শ্রুতি বা বেদ। শ্রুতির নির্ণয় অভ্রান্ত। বেদ স্বতঃপ্রমাণ। তাই তার মুখ্যার্থ ছেড়ে লক্ষণার্থ করলে সেই স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয়।

সার্বভৌম শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী ভাষ্য অনুযায়ী ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করেছেন মহাপ্রভুর কাছে। এই ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রহ্ম হলেন নির্বিশেষ অর্থাৎ তাঁর কোনো বিশেষত্ব নেই। সমস্ত বিশেষত্বরহিত ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি, নির্বিশেষে; অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পর্কে এই নেতির পথ অবলম্বন করে এগিয়ে গিয়ে বলতে হয়— "মৌন ব্যাখ্যা প্রকটিত পরব্রহ্মতত্ত্বম্।"

কেন-না, নির্বিশেষে ব্রহ্মর ব্যাখ্যা কারণেই তিনি সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, যখনই বলা হয় ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষ— তখন এগুলোই হয়ে যায় ব্রহ্মর বিশেষ গুণ যার দ্বারা তিনি সবিশেষ হয়ে পড়েন। সুতরাং ব্রহ্মের কোনো ব্যাখ্যা করা চলবে না। শুধু তাই নয়, শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অনুসারে সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সবই অলীক কল্পনা মাত্র। মায়াবাদে ঈশ্বরেরও কোনো পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি । অর্থাৎ ঈশ্বরও মায়া। সুতরাং শঙ্করাচার্যের মতানুযায়ী নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদে আর সকলই মায়া মাত্র।

সার্বভৌমের এই অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা শুনে মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য-কৃত নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদকে খণ্ডন করে বলেছেন—

"বেদপুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ।।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান।।"

বৃংহন ধাতু-জাত ব্রহ্ম শব্দের মূল অর্থই হল বৃহৎ।— "বৃংহনি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম।" অতএব ব্রহ্ম নির্বিশেষ হতে পারেন না। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী ভাষ্যে যে ব্রহ্মকে সত্য বলা হয়েছে, তিনি নির্বিশেষে ব্রহ্ম। কিন্তু মহাপ্রভু এই মতকে খণ্ডন করে বলেছেন যে, ব্রহ্ম কখনোই নির্বিশেষে নন, তিনি সবিশেষ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে কীর্তিত হয়ে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।।
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ।।"

কোনো কোনো উপনিষদও ব্রহ্মকে নির্বিশেষে বলেন । শঙ্করাচার্য সেই শ্রুতি সমূহকে প্রাধান্য দিয়েই ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেছেন। মহাপ্রভু এই মতকে ভ্রান্ত বলেছেন।

কেন-না, যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেছেন, সেই শ্রুতিই আবার ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলেছেন। তবে ব্রহ্মের বিশেষত্ব অপ্রাকৃত। তাঁর প্রাকৃত বিশেষত্ব নেই বলেই তিনি নির্বিশেষ। আবার ব্রহ্ম সবিশেষ, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। মহাপ্রভুর মতে—

"অপাণি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ।।
অতত্রব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ।।"

ব্যাকরণের তিনটি কারকের উল্লেখ করে মহাপ্রভু ব্রহ্মের সবিশেষত্বকে প্রমাণ করেছেন। কারক তিনটি হল— অপাদান, করণ ও অধকরণ। অপাদেনর লক্ষণ 'থেকে' 'হইতে', করণের 'দ্বারা' 'কতৃক'; অধিকরণের 'এ' 'তে'। ব্রহ্ম থেকেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ব্রহ্মের দ্বারাই সকল কিছু সৃষ্টি এবং সংরক্ষিত ব্রহ্মাই সকল কিছুর পরিণাম, আশৈশব ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাপ্রভু ব্যাকরণের সাহায্যেই ব্রহ্মের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব প্রমাণ করে বলেছেন—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্ম পুনরপি হয়ে যায় লয়।।"

মহাপ্রভু-কথিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই দিকটি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির লেখনী-মুখে—

"তোঁহে জনমি পুন তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।"

এরপর মহাপ্রভু ব্রহ্মের ঈশ্বর লক্ষণ প্রমাণ করেছেন। মায়াবাদী শঙ্করাচার্য ঈশ্বরকেও বলেছেন মায়া। সার্বভৌম তাঁর ব্যাখ্যাকালে এই মায়াবাদকেই সমর্থন করেছেন। মহাপ্রভু তাতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে যুক্তিদ্বারা নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

" ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্র পরিমাণ।।"

এবং— "ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহস্বরূপ। শ্রীভগবান হলেন ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ। এই ষড়ৈশ্বর্য হল— ১) ঐশ্বর্য, ২) বীর্য ৩))যশঃ, ৪) শ্রী ৫) জ্ঞান, ৬) বৈরাগ্য — এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য। এই ষড়ৈশ্বর্য ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস। কিন্তু শঙ্করাচার্যর মতানুসরণ করে সার্বভৌম সেই শক্তিকে মানেননি। তাই মহাপ্রভু বলেছেন—

"ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।

হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস।।"

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।

ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান।।"

এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান। এটি তাঁর অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। তাঁর এই স্বরূপ শক্তির তিনটি অংশ। এছাড়াও তাঁর আছে তটস্থা শক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

বর্তমান আলোচনায় আমরা একটি রেখাচিত্রের দ্বারা মহাপ্রভু কথিত সচ্ছিদানন্দময় ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিকে দেখাতে পারি —

যে ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যময় এবং পূর্ণানন্দময় বিগ্রহস্বরূপ, জিনি স্বাভাবিকভাবেই ত্রয়ী শক্তির আকর, তাঁকে সার্বভৌম শঙ্করাচার্যের মত অনুসরণ করে নিরাকার, নির্বিশেষ, নিঃশক্তি বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, — একথা মহাপ্রভু কোনোমতেই মেনে নিতে পারেননি। গীতায় আছে, তিনি ব্রহ্মরও প্রতিষ্ঠাস্থল —

"ব্রহ্মণাহি প্রতিষ্ঠাহম্।"

অতএব বিবর্ত্তবাদী শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ ব্রহ্মের চেয়েও ঈশ্বর যে শ্রষ্ঠ তা প্রমাণিত হয়। ঈশ্বর যে Supreme Lord - একথা শ্রীঅরবিন্দও তাঁর গীতাভাষে বলেছেন—

"— The Gita is going to represent Iswara, the Purushottama, as higher even than still and immutable Brahma and the loss of ego in the impersonal comes only as a great and initial step toward union with Purushothama. This is the supreme devine God, Who posses both the infinite and the finite and in whom the and the impresonal the one self and the many existances are united. —"

কিন্তু শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী ভাষ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। কেন-না ঈশ্বর সবিশেষ, অতএব তিনি মায়া। তাঁর মতে জীব এবং ঈশ্বরের উপাধি হল মায়া; এই মায়া দূরীভূত হলে জীব এবং ঈশ্বর দুই-ই থাকেন না।

শঙ্করাচার্যের মতানুসারে জীব এবং ঈশ্বর যেখানে থাকেন না, সেখানে শুদ্ধ অদ্বয় নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকন। শঙ্করাচার্য পন্থী কেবলাদ্বৈতবাদী মাধ্বাচার্য বিদ্যারণ্য তাঁর 'পঞ্চদশ' গ্রন্থে লিখেছেন- "মায়য়া কল্পিতাবেতৌ" অর্থাৎ, ঈশ্বর এবং জীব উভয়েই মায়ার দ্বারা কল্পিত।

সার্বভৌমও শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে অনুসরণ করে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ঈশ্বরস্বরূপকে সত্ত্বগুণের বিকার বলেছেন। মহাপ্রভু এই মত খণ্ডন করে বলেছেন, শ্রীবিগ্রহকে যে না মানে সে পাষণ্ড মাত্র। শুধু তাই নয়, বেদকে না মেনে বৌদ্ধ হয়েছেন নাস্তিক। আর বেদকে আশ্রয় করেও যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন না তাঁরা পরম নাস্তিক।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই বলেই এই মতবাদকে monism (অদ্বৈতবাদ) বলা হয়েছে, monotheism (একশ্বরবাদ) বলা হয়নি। এর বিরুদ্ধেই মহাপ্রভু নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আসলে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ভ্রমাত্মক হওয়ার মূল কারণ হল, তিনি শ্রুতির ব্যাখ্যায় লক্ষণাবৃত্তির দ্বারস্থ হয়েছেন, যেখানে বাচ্যার্থ গৌণ হয়ে গেছে। ফলে তিনি শ্রুতির সহজ সরল অর্থ পরিত্যাগ করে কল্পিত অর্থকে গ্রহণ করেছেন। তাই, তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপ সবিশেষ ব্রহ্মকে নির্বিশেষেরূপে কল্পনা করেছেন। ফলে তাঁর ভাষ্যে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপের হানি হয়েছে।

মহাপ্রভুর মতে ব্রহ্মই স্বয়ং পূর্ণ ভগবান, তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী এবং সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ স্বরূপ। সার্বভৌমের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি ব্রহ্মই যে ঈশ্বর একথা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে নিজের অভিমত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অভিমত হল—

"ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্র পরমাণ।।"

.....

"ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার।।"

.....

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।

সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।"

মহাপ্রভুর মতে, অপ্রাকৃত স্বরূপ ব্রহ্ম লীলারস আস্বাদনের জন্যই বহু হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখনই তিনি প্রাকৃত শক্তিতে দৃষ্টি দেন। এর পূর্বে প্রাকৃত মনশ্চক্ষুর জন্ম হয়নি, যেজন্যই ব্রহ্মের নেত্র ও মন অপ্রাকৃত।

শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদী ভাষ্যে জগৎকে মিথ্যা মায়া বলেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু এই মতকে খণ্ডন করে বলেছেন জগৎ মিথ্যা নয়। কেন-না, জগৎ ব্রহ্মেই জাত, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই লীন হয়। ব্রহ্ম যার আধার, সেই জগৎ কোনোমতেই মিথ্যা হতে পারে না। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

"কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।

কৃষ্ণের শরীর সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম।।"

জগৎ সম্পর্কে ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন—

"We see clearly that there is no basis for any conception of the unreality of the world in the hymns of the Rig-veda. The world is not purposeless Phantasm, but is just evolution of God."

[Indian Philosophy, Vol. I, Page 103-104]

এছাড়াও এ-সম্পর্কে K. Damodaran বলেছেন— "None of the Upanisads denied the reality of the world or suggested that earthly life was an illusion or Maya." (Indian Thought : A Critical Survey, page-249]

জগৎ সৃষ্টি- প্রসঙ্গে দুটি মতবাদ রয়েছে- ১) পরিণামবাদ ২) বিবর্ত্তবাদ। একবস্তু যদি অপরবস্তুতে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে পরিণামবাদ। যেমন-দুগ্ধের দধিতে পরিণতি। আর একটি বস্তুকে যদি অপর বস্তু বলে ভ্রম হয়, তবে তাকে বলে বিবর্ত্তবাদ। যেমন— রজ্জুতে সর্পভ্রম।

শঙ্করাচার্য ছিলেন বিবর্ত্তবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে জগৎ হল অলীক মায়া মাত্র। তাঁর মতে ব্রহ্মকে জগৎ-ভ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মকেই জগৎ বলে ভ্রম হয়। মায়ার প্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। ব্যাসসূত্রে বলা হয়েছে- " আত্মকৃতে পরিণামাৎ"। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেকে জগৎ রূপে পরিণত করেছেন, অথবা জগৎ ব্রহ্মরই পরিণতি। কিন্তু শঙ্করাচার্য এই ভাষ্যের অভিধার্থকে ত্যাগ করে লক্ষণার্থকে গ্রহণ করে ব্যাসকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেছেন এবং লক্ষণার্থকে গ্রহণ করে ব্যাসকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেছেন এবং স্বকপোলকল্পিত বিবর্ত্তবাদকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম কখনোই বিকারপ্রাপ্ত হতে পারেন না, পরিণাম হয় ব্রহ্মের শক্তির। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির ফলেই ব্রহ্মের বিকার ঘটা সম্ভব নয়।

মহাপ্রভু যুক্তির দ্বারা এই অভিমতকে খণ্ডন করে ব্যাসসূত্র সম্মত পরিণামবাদকেই স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন—

"মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।

জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অধিকার।।"

অর্থাৎ, মণি যেমন স্বর্ণ প্রসব করেও অবিকৃত থাকে, সেরূপ ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েও তাঁর অচিন্ত্যশক্তিতে অবিকৃত থাকেন।

শঙ্করাচার্যের এই অভিমতের মূলে রয়েছে চারটি শ্রুতিবাক্য। যেমন— ১। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঋগ্বেদ) ২। অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ); ৩। তত্ত্বমসি (ছান্দোগ্য উপনিষদ); ৪। অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ববেদ) । এই 'তত্ত্বমসিতত্ত্ব'কেই শঙ্করাচার্য মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং এর অর্থ নির্ণয়েও মুখ্যার্থ ছেড়ে তিনি লক্ষণার্থকে গ্রহণ করেছেন। 'তত্ত্বমসি' শব্দের অর্থ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে 'তৎ-ত্বম-অসি' অর্থাৎ 'তুমি যে হও'। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই।

সার্বভৌমের সঙ্গে বিতর্ককালে মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের এই মতকে খণ্ডন করেছেন। 'তত্ত্বমসি' শব্দের মহাপ্রভু কৃত ব্যাখ্যা হল- 'তস্য-অসি-ত্বম্' অর্থাৎ 'তাঁর হও তুমি'। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মরই শক্তি। তাছাড়া 'তত্ত্বমসি তত্ত্ব' প্রাদেশিক বাক্য, তাই একে মহাবাক্য হিসেবে গ্রহণ করতে মহাপ্রভু নারাজ। মহাপ্রভু 'প্রণব'কেই মহাবাক্য বলেছেন। কেন-না প্রণব থেকেই জগতে সর্ববেদের উৎপত্তি।

মহাপ্রভুর শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে খণ্ডন করে সার্বভৌমকে বুঝিয়েছেন— "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়া ঈশ্বরেরই বহিরঙ্গা শক্তি। অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন মায়ার অধীশ্বর; আর জীব হল মায়াবশ অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই মায়াশক্তির অধীন। অর্থাৎ এককথায় বলা যায়, ঈশ্বরের দ্বারাই মায়ার সৃষ্টি এবং জীব সেই মায়ারই বশ। অতএব অধীশ্বরের সঙ্গে অধীনের পার্থক্যতো থাকবেই। কিন্তু সার্বভৌম শঙ্করাচার্যের মতবাদকে অনুসরণ করে ঈশ্বরের ও জীবের অভেদ কল্পনা করেছেন।

মহাপ্রভু এই অভিমতকে ভ্রান্ত বলে স্বয়ং ব্রহ্ম ও জীবের প্রকৃত স্বরূপের ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন— ব্রহ্মের তিন শক্তি হল— অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা শক্তি জীব। ব্রহ্ম বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবের সৃষ্টি করেন। সুতরাং জীব মায়ার বশীভূত, আর ব্রহ্ম সেই মায়ার অধীশ্বর মায়াধীশ। মায়াশক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি হলেও তা ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। আবার জীব ব্রহ্মরই শক্তি তাই শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, অথচ জীব তটস্থা শক্তি বলে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন। জগৎ ও জীব যেহেতু শক্তিমান ঈশ্বরেরই শক্তি তাই তা মিথ্যা নয়; কিন্তু তা নশ্বর আর ব্রহ্ম অবিনশ্বর। সুতরাং, ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ এক ও অভিন্ন নয়। আসলে ব্রহ্ম তাঁর অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা নিজেকে অবিকৃত রেখে জীব ও জগতে পরিণত হন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"অনন্ত স্ফটিছে যৈছে এক সূর্য ভাসে।

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।"

এইরূপে মহাপ্রভু সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত বিচারকালে একে একে শঙ্করাচার্যের সকল মতকে খণ্ডন করেছেন এবং পরিণামবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সার্বভৌমকে বুঝিয়েছেন যে, ব্যাস- সূত্রে জীবের নিস্তারের পন্থা রয়েছে। কিন্তু মায়াবাদী ভাষ্য জটিলতার সৃষ্টি করে জীবকে ভক্তিহীনতার পথে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কেন-না, জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই মায়াধীন জীবের হৃদয়ে অহং ভাবের সৃষ্টি হয়, যা ভক্তি পথের অন্তরায় স্বরূপ, অতএব, মহাপ্রভুর মতে "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" পরবর্তীকালে তা অন্যদের দ্বারাও স্বীকৃতি পেয়েছে। R.C. Zahner- ও শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে "Destructive of Religion" বলেছেন।

ষড়ৈশ্বর্যশালী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের উপাসনা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সম্ভব। জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে তাঁকে নির্বিশেষে ব্রহ্মে এমনকি শূন্যে পরিণত করা যায়, কিন্তু তা বুদ্ধির অধ্যাবসায় মাত্র— তাতে জীবের কল্যাণ নেই। জ্ঞানমার্গের সাধনার দ্বারা সাধক মুক্তিলাভ করতে পারেন কিন্তু তার চেয়েও বড় ভক্তিপ্রেমের অলৌকিক রসাস্বাদ- জ্ঞানের পথ ধরে সেই রস অস্বাদন করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই মহাপ্রভু জ্ঞানমার্গ তথা মায়াবাদকে নস্যাৎ করে ভক্ত-হৃদয়-মন্দিরে প্রেমিক ঈশ্বরের মধুর রূপকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কেন-না, তাঁকে অন্তরে লাভ করতে হলে একমাত্র পন্থা এই প্রেমভক্তি, অন্য কিছু নয়।

সতঃ প্রমাণ বেদে তিনটি মহাবস্তুর কথা উল্লিখিত আছে—

"ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম- প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়।।"

বেদর বর্ণনীয় এই তিনটি বস্তু হল— (১) 'সম্বন্ধ' বা প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবান (ব্রহ্ম), (২) 'অভিধেয়' বা জীবের কর্তব্য- তা হল সাধন ভক্তি, (৩) 'প্রয়োজন' হল ভগবৎ-প্রেম।

মহাপ্রভুর অভিনব ব্যাখ্যা শুনে পরমবিস্মিত সার্বভৌমকে মহাপ্রভু বলেছেন, ভগবানে ভক্তিই হল পরমপুরুষার্থ। ভারতীয় জীবন-দর্শন অনুযায়ী চারিটি পুরুষার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চতুর্বর্গের মধ্যে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ বা মুক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলে শঙ্করাচার্য গ্রহণ করেছেন।

অর্থাৎ শঙ্করাচার্য চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ তথা লীনমুক্তিকেই জীবের পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য হল নির্বিশেষ ব্রহ্মে আত্যন্তিক লয় বা সাযুজ্য মুক্তি। কিন্তু ভক্ত কখনো মুক্তি কামনা করেন না।

মহাপ্রভুও মোক্ষ বাঞ্ছাকে 'এহো বাহ্য' বলে ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে —

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।"

কারণ, চতুর্বর্গের চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তি শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ভক্তি হল পঞ্চম পুরুষার্থ। গৌতমীয় তন্ত্রে ভক্তিও মুক্তি সম্পর্কে নারদ মন্তব্য করেছেন—

"ভদ্রমুক্তং ভবদ্ভিস্তু মুক্তিস্তুর্যা পরাৎপরা" — 'পরাৎপরা মুক্তি তুর্যা অর্থাৎ তুরীয় চতুর্থস্থানীয়া, তা উত্তম'; কিন্তু "পূর্ণহন্তাময়ী ভক্তিস্তর্যাতীতা নিগদ্যতে।" — অর্থাৎ পূর্ণহন্তাময়ী ভক্তি হল চতুর্থস্থানীয় মুক্তির অতীত, তা পঞ্চমস্থানীয়া (পঞ্চম পুরুষার্থ)। মহাপ্রভুও এই ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। তাঁর মতে, নিত্যমুক্তি আত্মারাম সিদ্ধ পুরুষগণও ঈশ্বরের ভক্তিতে আকৃষ্ট হন এবং এক্ষেত্রে সনক, সনন্দ, সনাতন, শুকদেব আদি স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ সাধকদের ভক্তি অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, আত্মারাম মুনিগণ বিধিও নিষেধের অতীত হয়েও সেই প্রচুর পরাক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী (হেতুহীন অর্থাৎ ফল কামনা শূণ্য) ভক্তি করে থাকেন। শ্রীহরির গুণই এই প্রকার।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমথম্ভূত গুণো হরি।।" (১।৭।১০)

মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোক শুনে সার্বভৌম এর অর্থ শুনতে চাইলে মহাপ্রভু সার্বভৌমকে আগে এই শ্লোকের অর্থ করতে বলেন এবং বলেন যে তাঁর অর্থ শোনার পর মহাপ্রভু স্বয়ং এর অর্থ প্রকাশ করবেন। সার্বভৌম তর্কশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী এই শ্লোকের নয়টি ব্যাখ্যা করেন। মহাপ্রভু সেই নয়টি অর্থের একটিকেও স্পর্শমাত্র না করে এই শ্লোকের আঠারোটি ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে মহাপ্রভু প্রখর মায়াবাদী অদ্বৈতপন্থী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদান্ত বিচার করে তাঁকে জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করান। মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের অন্তরে এমনভাবে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রস্ফুটিত হয় যে তিনি একদিন মহাপ্রভুর সম্মুখে ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পাঠ করতে গিয়ে 'মুক্তি-পদ'- এর পাঠান্তর করে 'ভক্তিপদ' করেন। মহাপ্রভু এর কারণ জানতে চাইলৈ সার্বভৌম তার ব্যাখ্যা করেন।

মুক্তি পাঁচ প্রকার- সালোক্য,সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য। এই পঞ্চমুক্তি সাধকের সাধনার ধন। সাধনার দ্বারা ঈশ্বর যে লোকে অবস্থান করেন সেইলোকে অবস্থান অর্থাৎ সমলোকে অবস্থান হল সালোক্য। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকা বা ঈশ্বর সমীপে থাকা হল সামীপ্য। সাধানার দ্বারা ঈশ্বরের মতো রূপ পাওয়া বা সমরূপ প্রাপ্তি হল সারূপ্য। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সমগতি প্রাপ্তি বা সম রিষ্টি প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি। আর সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ "এক দেহদেহিত্ব" প্রাপ্তি হল সাযুজ্য মুক্তি। এই সাযুজ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগরূপ মুক্তি।

এই পঞ্চমুক্তির মধ্যে প্রথম চারটি সেবার বিরোধী নয়। কেন-না এর মধ্যে ভক্তের সেবার সুযোগ থাকে। সেজন্য ভক্ত এই চাররূপ মুক্তিকে কখনো অঙ্গীকার করতেও পারেন। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে 'একদেহ দেহিত্ব' প্রাপ্তি ভক্তের কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। ঈশ্বর-ভক্ত নরক পর্যন্ত কামনা করতে কুণ্ঠিত হবেন না, কিন্তু 'সাযুজ্য' শ্রবণ করতেও তাঁর ঘৃণার উদ্রেক হয়। ভক্তের এই ঘৃণাও ত্রাসের কারণ হল, ভক্তি জীব হল কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাই কৃষ্ণের সেবক কখনোই কৃষ্ণের সঙ্গে একত্বপ্রাপ্তি চাইতে

পারেন না; মুক্তি পদের চেয়ে কৃষ্ণপদই তাঁর কাছে বেশি কামনার ধন এবং কৃষ্ণপদসেবার মাধ্যমেই তাঁর ভক্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সার্বভৌমের এ-সম্পর্কে অভিমত হল—

"মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস।।"

এইরূপে মায়াবাদী জ্ঞানমার্গের পথিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-স্পর্শমণির কৃপায় পরম ভক্ত বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীপদে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করেন।

## ৫.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি চৈতন্য-জীবনী বিষয়ক বাংলায় রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইতিহাস, দর্শন, তত্ত্ব তো আছেই, এবং সর্বোপরি এটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-জীবনীকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যাখ্যা, তত্ত্বকথা এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি এই গ্রন্থে কাব্যকারে প্রকাশ করেছেন।

আলোচ্য বিভাগে আমরা সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার প্রসঙ্গ ও সার্বভৌমের উদ্ধারের কাহিনি অবতারণা করেছি। এই বিভাগে আমরা দেখেছি যে মহাপ্রভু সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত-বিচারকালে একে একে শঙ্করাচার্যের সকল মতকে খণ্ডন করেছেন এবং পরিণামবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইরূপে মহাপ্রভু প্রখর মায়াবাদী অদ্বৈতপন্থী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদান্ত বিচার করে তাঁকে জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করান। শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পরম ভক্ত বৈষ্ণব হয়ে উঠেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজকে সমর্পণ করেন।

## ৫.৪ সংক্ষিপ্ত টীকা (Summing Up)

এবার আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক টীকা আলোচনা করব।

**শঙ্করাচার্য :** বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যকারণের মধ্যে আচার্য শঙ্কর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বেদান্ত-ভাষ্য অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা শঙ্করাচার্য। তাঁর জন্ম কেরালায় ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ বংশে। শৈশবকাল হতেই তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভাষ্য রচনা করে তিনি বেদান্ত মত প্রচারে ব্রতী হন। শঙ্করাচার্য-কৃত উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র— এই প্রস্থানত্রয়ীর ভাষ্য শঙ্কর-ভাষ্য নামে খ্যাত। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনিদেহত্যাগ করেন। তাঁর ভাষ্যের মূল কথা হল, "ব্রহ্মসত্যম্ জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" —অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই চরাচর জগৎ হল মিথ্যা তথা মায়িক এবং জীব হল স্বয়ং ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য-কৃত এই বেদান্ত-ভাষ্য আসলে উপনিষদ, গীতা

এবং ব্রহ্মসূত্র — এই প্রস্থান ত্রয়ীর অদ্বৈতমার্গীয় বা জ্ঞানমার্গীয় বা কেবলাদ্বৈতবাদী বা নির্বিশেষাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী ভাষ্য। এই ভাষ্য বলে— ব্রহ্ম হলেন নির্বিশেষ, অর্থাৎ যাঁর কোনো বিশেষত্ব নেই। ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষত্ব রহিত অর্থাৎ তিনি নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ অর্থাৎ এই নেতি নেতি করে পৌঁছাতে হয়—

"মৌন ব্যাখ্যা প্রকটিতং পরব্রহ্মতত্ত্বম্"।

এই মতবাদ অনুযায়ী সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সবই অলীক কল্পনা। শঙ্করাচার্য মতবাদে ঈশ্বরেরও কোনো পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। অর্থাৎ, ঈশ্বরও মায়া। সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম বাদে আর সকলই মায়া। যেহেতু শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই, তাই এই মতবাদকে (monism)(একের মতবাদ) বলা হয়েছে, (monotheism)(একেশ্বরবাদ) বলা হয়নি।

জগৎ-সৃষ্টি প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য ছিলেন বিবর্ত্তবাদী। বিবর্ত্তবাদ হল এক বস্তুকে অপর বস্তু বলে ভ্রম হওয়া। শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ হল অলীক মায়া মাত্র, ব্রহ্মকেই জগৎ বলে ভ্রম হয় রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো।

শঙ্করাচার্য জীবকে ব্রহ্ম বলেছেন। তিনি চারটি শ্রুতি থেকে চারটি বাক্য উদ্ধার করেছেন— ১) 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (ঋক্‌বেদ), ২) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ), ৩) 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য উপনিষদ), ৪) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (অথর্ববেদ)। এই 'তত্ত্বমসি' তত্ত্বকেই শঙ্করাচার্য মহাবাক্য রূপে গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্ম ও জীবকে অভেদ কল্পনা করেছেন।

ভারতীয় জীবন দর্শন অনুযায়ী চারটি পুরুষার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্য চতুর্থ পুরুষার্থ 'মোক্ষ' তথা লীনমুক্তিকেই জীবের পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য হল নির্বিশেষ ব্রহ্মে আত্যন্তিক লয় বা সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব প্রাপ্তি বা 'একদেহদেহিত্বপ্রাপ্তি'-রূপ মুক্তি।

এইরূপে শঙ্করাচার্য জ্ঞান-মার্গ অবলম্বনে ব্রহ্ম-ঈশ্বর-জগৎ-জীবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। পরবর্তীকালে সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত-বিচার প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শঙ্করাচার্যের মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সেদিন যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ভক্তি আন্দোলন নামে খ্যাত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ছিলেন এই ভক্তি আন্দোলনের এক অন্যতম পথিকৃতৎ।

**সার্বভৌম ভট্টাচার্য :** বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যে নীলাচলের বহুখ্যাত পণ্ডিত, বেদান্ত বিশারদ। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে তিনি নবদ্বীপে রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ (মতান্তরে নরহরি)।

মহাপ্রভুর জন্মকালে নবদ্বীপে রাজভয় উপস্থিত হলে সার্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করে পুরীতে চলে যান বলে জয়ানন্দ উল্লেখ করেছেন। ইনি পুরুষোত্তমবেদ (১৪৬৫-

১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দ) ও প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৬-১৫৩৯) সভা সুদীর্ঘকাল অলঙ্কৃত করেছিলেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই গুণী ব্যক্তিকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব পুরীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি সভাপণ্ডিত হন। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক সার্বভৌম ছিলেন মায়াবাদী বৈদান্তিক। তিনি ছিলেন ষড়-দর্শন কৃতবিদ্য।

মহপ্রভু চৈতন্যদেব পুরীতে উপস্থিত হলে সার্বভৌম এই তরুণ সন্ন্যাসীকে 'বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে' প্রবেশ করানোর অভিপ্রায়ে সাতদিন একনাগাড়ে বেদান্ত পাঠ করে শোনান শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভু সার্বভৌমের বেদান্ত-বিচার তথা শঙ্করাচার্যের অভিমত খণ্ডন করেন। শঙ্করাচার্যের "ব্রহ্ম সত্যম্, জগৎন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নপরঃ " এই মতবাদ, 'নির্বিশেষ নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম' 'ঈশ্বর এবং জগৎ মিথ্যা মায়া' 'জীব ও ব্রহ্ম অভেদ' অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ' 'মায়াবাদ' 'তত্ত্বমসি তত্ত্ব' 'বিবর্ত্তবাদ' ইত্যাদি মতবাদ খণ্ডন করে সার্বভৌমকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' 'পরিণামবাদ' 'ব্রহ্ম- ঈশ্বর-জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ' ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করান এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের 'অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্বকে' প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে বিস্মিত সার্বভৌম জ্ঞানমার্গ পরিহার করে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে পরমভক্তে পরিণত হন। সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার এবং ঘোর মায়াবাদী সন্ন্যাসী সার্বভৌমকে উদ্ধারের কাহিনি "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।

**অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব :** বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা করে 'অদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠা করার পর এর বিরোধিতা করে দক্ষিণ ভারতে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ'কে খণ্ডন করেছেন, এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহাচৈতন্যদেবের দ্বারা প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্ণধার বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী এই ভেদাভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন যে—

"শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্তৌ ইতি"।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে ব্রহ্ম-জগৎ -জীব-সম্বন্ধ- প্রসঙ্গে বলেছেন— "ব্রহ্মসত্যম্, জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপারঃ"। শঙ্করাচার্যের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। আর সকলই মিথ্যা, মায়া। আর জীব হল ব্রহ্ম। এই যে জগৎ মিথ্যা মায়া এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব— গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এই মতবাদকে স্বীকার করেন না। তাঁরা শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ ব্রহ্মকেও স্বীকৃতি দেননি। তাঁদের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী। এই ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান স্বয়ং শক্তিমান। তাঁর তিনটি শক্তি — অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা মায়া শক্তি এবং, তটস্থা শক্তি জীব। শক্তি যেহেতু শক্তিমানেরই বিশেষত্ব, তাই শক্তিও শক্তিমানে যেমন অভেদত্ব তেমণি আবার ভেদও বিদ্যমান। মায়াশক্তি ঈশ্বরেরই বহিরঙ্গা শক্তি। তাই শক্তিমান ঈশ্বর হলেন মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর। আর জীব

প্রাকৃত জগতে জন্ম গ্রহণ করে এই মায়ার অধীন হয়। অর্থাৎ জীব হল মায়াধীন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বলেছেন—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ।।"

আসলে ঈশ্বর এবং জীবের ভেদ এক; অভেদ উভয়ই বর্তমান। ঈশ্বর শক্তিমান আর জীব হল তটস্থা শক্তি, লীলাময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। তট যেমন সাগরকে স্পর্শ করে থাকলেও সে সাগর নয়, ঈশ্বর এবং জীবের সম্বন্ধও তেমনি। কস্তুরী যেমন তার গন্ধের আকর, অথচ কস্তুরী ও গন্ধ এক বস্তু নয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর ও জীবের ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ। প্রাকৃত জ্ঞান দিয়ে এই সম্বন্ধের বিচার করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণেও বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের অখণ্ড শক্তি অচিন্ত্য। অচিন্ত্যতত্ত্ব হল সেই তত্ত্ব, যুক্তিতর্ক দ্বারা যে জ্ঞান বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, অথচ, যার সত্যতাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই সব সম্ভব হয়েছে। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি অগ্নি নয়, তা সহজেই অনুভবগম্য। সুতরাং, এদের ভেদ প্রতীতি সহজেই হয়। আবার অগ্নি হতেই তার দাহিকা শক্তির সৃষ্টি— সুতরাং দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হতে সম্পূর্ণ পৃথক বলেও ভাবা যায় না। দুইয়ের মধ্যে এক ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে, সুতরাং, উভয়ের মধ্যে, অভেদপ্রতীতিও হয়। জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্কও এইরূপ। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলায় বলা হয়েছে—

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।"

তথাপিও ঈশ্বর এবং জীব একনয়। এই ভেদ ও অভেদ তত্ত্ব অচিন্ত্য তত্ত্ব। সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত বিচারকালে মহাপ্রভু ব্রহ্ম-জীব-জগতের সম্বন্ধ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার থেকেই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছে।

**মায়াবাদ :** শঙ্করাচার্যের বেদান্ত -সম্পর্কিত মতবাদকে বলা হয় মায়াবাদ। শঙ্করাচার্যের মতে "ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপারঃ"। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর সবই মায়া বা প্রতীতি। জীবও আসলে ব্রহ্মই, মায়ার প্রভাবেই জীবের প্রতীতি। জগতও মিথ্যা বা মায়া। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে বলা হয় ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ, অর্থাৎ এই নেতির পথ অবলম্বন করে যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারি সেখানে কেবল বলা যায়—

"মৌন ব্যাখ্যা প্রকটিতম্ পরম ব্রহ্ম"।

অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পর্কে মৌন হতে হয় কেন না, মুখর হলেই ব্রহ্ম সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হন। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে ঈশ্বরেরও কোনো স্থান নেই। আর উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' তত্ত্ব অবলম্বন করেছেন শঙ্করাচার্য, তাই তিনি জীব ও ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞান করেছেন। তাঁর মতে আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তা একমাত্র মায়ার প্রভাব। তাঁর মতে ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে এই জগৎ থেকে শুরু করে যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে তা

সকলই মায়ার প্রভাব। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে পুরীতে বেদান্ত বিচারকালে মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের এই মায়াবাদকে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন—

"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।"

কেন-না ভক্তিমার্গের প্রথম এবং প্রধান কথাই হল বিশ্বাস। মায়াবাদে যেহেতু সকল কিছুরই অলীকত্ব দেখানো হয় সুতরাং, সেখানে বিশ্বাসের কোনো স্থান থাকে না। শুধু তাই নয়, যখনই বলা হয় 'তত্ত্বমসি অর্থাৎ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরে ও জীবে কোনো ভেদ নেই— সেই মুহূর্তে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্য জীবের হৃদয় অধিকার করে তাকে অহংকারী করে তোলে এবং তার অন্তর থেকে ভক্তিভাব দূরে সরে যায়। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধই হল ভক্তির। কেন-না জীবের স্বরূপ হল কৃষ্ণের নিত্যদাস। সুতবাং কৃষ্ণভক্তিই হল তার কৃষ্ণসেবা। কিন্তু 'সোহহং' মত জীবের অন্তর থেকে এই সেব্য-সেবকের ভাবকে বিদূরিত করে । যেতন্যই মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের এই মায়াবাদকে খণ্ডন করেছেন।

**বিবর্ত্তবাদ :** জগৎ সৃষ্টি প্রসঙ্গে দুটি মতবাদ রয়েছে — একটি হল পরিণামবাদ, অপরটি হল বিবর্ত্তবাদ।

একটি বস্তুকে যদি অপর বস্তু বলে ভ্রম হয়, তবে তাকে বলা হয় বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্তবাদের সুন্দর উদাহরণ হল রজ্জুতে সর্পভ্রম।

ব্রহ্ম ও বিশ্বের মধ্যে কার্যকরণ সম্বন্ধ নিয়েই বিবর্ত্তবাদ ও পরিবর্তনবাদের উদ্ভব। বিবর্ত্তবাদীদের মতে "ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, অলীক এবং জীব আসলে ব্রহ্মই। এই মতবাদের উদ্‌গাতা অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য।

বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ হল ভ্রম বা ভ্রান্তি। মানুষ যেমন শক্তির ঔজ্জ্বল্যকে রজত বলে ভ্রান্ত হয়, অনুরূপভাবে অজ্ঞান মানব অজ্ঞানতাবশত পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলে জেনে ভ্রমে পতিত হয়। দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন অসত্য কায়াটা সত্য, তেখনি এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিবিম্বরে মতই অসত্য। আসল কায়া রূপ সত্য হলেন ব্রহ্ম। আর জগৎ মিথ্যা ভ্রান্তি মাত্র। বিবর্ত্তবাদীদের মতে ঈশ্বর জগতের কারণ নন। ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হন না। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নিরাকার নির্গুণ কিন্তু ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে পরিবর্তিত হন, তবে ব্রহ্মের এই বিশেষত্বগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্ম বিকৃত হন। সুতরাং ব্রহ্ম হতে জগৎ সৃষ্ট নয়। মায়ার জন্যই জগৎ প্রতিভাত হয়।

বিবর্ত্তবাদীদের মতে ব্রহ্ম হতেই জীবের সৃষ্ট। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম।

পুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে বেদান্ত-বিচার প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বিবর্ত্তবাদকে খণ্ডন করে পরিণামবাদকে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছিলেন যে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ নন। তাঁর অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব, সাকারত্ব, সগুণত্ব রয়েছে, জগৎও ভ্রান্তি নয়। ব্রহ্ম হতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মই জগতের কারণ। শ্রুতি শাস্ত্রে এর প্রমাণও রয়েছে।

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' রয়েছে—

"কৃষ্ণ একসর্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম।।"

আসলে ব্রহ্ম শক্তিমান, সেই শক্তিমানেরই বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই জগতের কারণ।—

"মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ- কারণ।"

জগতের কারণ ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, কিন্তু জগৎ মিথ্যা ভ্রম নয়।

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের তটস্থা শক্তি জীব হল কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবও ব্রহ্মের শক্তি। অতএব শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্তমান। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' আছে—

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।"

অত-এব জীব স্বয়ং ব্রহ্ম নয়, জগৎ ভ্রান্তি নয়। দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও পরিণতি এই জগৎ ষড়ৈশ্বর্যময় ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, জগৎ ও জীবের পালক ও সংহারক। ব্রহ্ম মায়াধীশ বা মায়ার অধীশ্বর, কেন-না মায়া ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গা শক্তি। আর জীব হল মায়ার অধীন অর্থাৎ মায়াবশ। এইরূপে বিবর্ত্তবাদকে খণ্ডন করে মহাপ্রভু পরিণানবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

**মুক্তি :** ভারতীয় জীবন-দর্শন অনুযায়ী চারটি পুরুষার্থকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের মধ্যে চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তিই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্যও চতুর্থ পুরুষার্থ 'মোক্ষ' তথা লীনমুক্তিকেই জীবের পরমপুরুষার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই মুক্তি পাঁচ প্রকার— সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাষ্টি এবং সাযুজ্য।

সাধনার দ্বারা ঈশ্বর যে-লোকে অবস্থান করেন সেই লোকে অবস্থান করা বা সমলোকে অবস্থান করাকে বলে সালোক্য। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থান করাকে বা সমীপে অবস্থানকে বলে সামীপ্য।

সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থান করাকে বা সমীপে অবস্থানকে বলে সামীপ্য। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের মতো রূপপ্রাপ্তি বা সমরূপতা প্রাপ্তিকে বলে সারূপ্য। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সমগতি প্রাপ্তি বা সমরিষ্টি প্রাপ্তিকে বলে সাষ্টি। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ রূপ মুক্তি বা একদেহদেহিত্ব অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্তিকে বলে সাযুজ্য মুক্তি।

উপরোক্ত চারটি মুক্তি সেবার বিরোধী নয়, কেন-না তাতে ভক্তের সেবার সুযোগ থাকে। কিন্তু পঞ্চম মুক্তিতে সেই সুযোগ থাকে না।

জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য হল নির্বিশেষ ব্রহ্মে আত্যান্তক লয় বা সাযুজ্য মুক্তি। কিন্তু ভক্ত কখনো মুক্তি কামনা করেন না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় বলা হয়েছে—

"তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।"

গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ মন্তব্য করেছেন— "ভদ্রমুক্তং ভবদ্ভিস্তু মুক্তিস্তুর্যা পরাৎপরা।"— অর্থাৎ পরাৎপরা মুক্তি তুর্যা অর্থাৎ চতুর্থস্থানীয়, তা উত্তম; কিন্তু "পূর্ণহন্তাময়ী ভক্তিস্তুর্যাতীতা নিগদ্যতে।"— অর্থাৎ পূর্ণহন্তাময়ী ভক্তি হল চতুর্থ স্থানীয় মুক্তির অতীত, তা পঞ্চম স্থানীয় অর্থাৎ পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলেছেন—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত

কীয়মানং ন গৃহ্ণান্তি বিনা মৎ যেবনং, জনাঃ।।" (৩।২৯।১০।১২)

অর্থাৎ, আমার ভক্তগণ কেবল সৎ সেবা ব্যতীত সাল্যেক্য আদি একত্ব প্রদান করলেও তা গ্রহণ করে না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও মোক্ষ বাঞ্ছাকে 'এহো বাহ্য' বলে ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে, নিত্যমুক্ত আত্মরাম সিদ্ধ পুরুষও ঈশ্বরের ভক্তিতে আকৃষ্ট হন এবং এক্ষেত্রে সনক, সনন্দ, সনাতন, শুকদেব আদি স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ সাধকদের ভক্তি অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ।

**পরিণামবাদ :** চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।

অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।।"

জগৎ সৃষ্টি প্রসঙ্গে দুটি মতবাদ রয়েছে— ১) পরিণানবাদ ও ২) বিবর্ত্তবাদ।

একবস্তু যদি অপরবস্তুতে পরিণত হয়, তবে তাকেই বলে পরিণামবাদ। যেমন, দুগ্ধের দধিতে পরিণতি।

শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদী ভাষ্যে বিবর্ত্তবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে জগৎকে মিথ্যা মায়া বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর বিবর্ত্তবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মই জগৎরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মায়ার প্রভাবেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শঙ্করাচার্যের মতে পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মের বিকার ঘটা কখনোই সম্ভব নয়।

সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত-আলোচনাকালে মহাপ্রভু যুক্তির দ্বারা শঙ্করাচার্যের এই অভিমতক খণ্ডন করে ব্যাসসূত্রে সম্মত-পরিণামবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ব্যাসসূত্রে বলা হয়েছে— "আত্মকৃতে পরিণমাৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজেকে জগৎরূপে পরিণত করেছেন, অথবা জগৎ ব্রহ্মেরেই পরিণতি। মহাপ্রভুর মতে, জগৎ মিথ্যা নয়, কেন-না, জগৎ ব্রহ্মাই জাত, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই লীন হয়।—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।।"

সুতরাং ব্রহ্মই যার আধার, সেই জগৎ কোনোমতেই মিথ্যা হরে পারে না।

এই সম্পর্কে ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ-ও বলেছেন—

"We see clearly that there is no basis for any conception of the unreality of the world in the hymns of the Rig-Veda. The world is not purposeless Phantasm, But is just evolution of God."

K. Damodaram ও বলেছেন— "None of the Upanisads denied the reality of the world or suggested that earttaly life was an illusion or Maya."

শুধু তাই নয়, মহাপ্রভুর অভিমত হল, পরিণামবাদে অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলেছেন—

"মণি থৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অধিকার।।"

অর্থাৎ, মণি যেমন স্বর্ণপ্রসব করেও অবিকৃত থাকে, সেরূপ ঈশ্বর জগৎ রূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন।

## ৫.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

## ৫.৬ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ- ৬

# চৈতন্যচরিত কাব্য

## চৈতন্যচরিতামৃত : শিক্ষাষ্টক

**বিষয় বিন্যাস**


৬.০ ভূমিকা (Introduction)

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৬.২ শিক্ষাষ্টক

৬.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৬.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৬.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৬.০ ভূমিকা (Introduction)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি বাংলা চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মধ্যযুগের এক ক্রান্তিকালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। মধ্যযুগের বাংলাদেশে তিনি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব। দেশের সমকালীন রাজনৈতিক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি যে উদারনৈতিক কৃষ্ণপ্রেমকথা প্রচার করেন, তা তথাকথিত আচার সর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান নয়; তা হল মানুষের ধর্ম। হিন্দু-অহিন্দু , পণ্ডিত-মুর্খ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে তিনি ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। এ নিঃসন্দেহে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্য নাম-সংকীর্তন— মূলত এই ত্রিবিধ আদর্শের উপরই মহাপ্রভুর ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।

অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মহাপ্রভু নিজের ধর্ম সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। শিষ্যদের উপদেশের মাধ্যমেই তিনি নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। চৈতন্যের জীবনই তাঁর বাণী— "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"। ভক্ত ও অনুচরগণকে তিনি মহৎ জীবনের আদর্শ ও কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর রচনা না থাকলেও তাঁর কথিত সংস্কৃতে রচিত কেবলমাত্র আটটি শ্লোক পাওয়া যায়। শিষ্যদের উদ্দেশ্যে কথিত বলে সেই আটটি শ্লোককে 'শিক্ষাষ্টক' নাম দেওয়া হয়েছে। এই আটটি শ্লোকে শুধু গভীর ভক্তি ও আদর্শের কথা ব্যক্ত হয়েছে , কোন সাম্প্রদায়িকতা বা আচার-অনুষ্ঠানের কথা সেখানে নেই।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

মহাপ্রভু নিজে ভক্তদের উদ্দেশ্যে কিছু লিখে যাননি। কিন্তু তিনি তাঁর আচরণের মধ্যে যে গভীর প্রেম ভক্তির স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তার দ্বারাই তিনি জগতকে শিক্ষা দান করে গেছেন। নাম ও প্রেম প্রচার— এই-ই ছিল তাঁর মূল চর্যা। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে যবন কাজী নত হয়েছে। রাজদরবারের কর্ম ছেড়ে রূপ-সনাতন বৈষ্ণব সেবাব্রত গ্রহণ করে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যের কাছে পরাজয় বরণ করে ভক্তিমার্গের আশ্রয় নিয়েছেন। উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর প্রসাদলাভে নিজেকে ধন্য মনে করেন। ঘোর তান্ত্রিক দস্যু জগাই-মাধাই প্রেমে বশীভূত হন।

এভাবেই মহাপ্রভু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে জাতিকে নতুন শক্তিতে উদ্দীপ্ত করলেন। শাসন নয়, অনুষ্ঠান নয়, আচার-বিচার-বিতর্ক নয়— তাঁর প্রেমময় বাণীই তাঁর শিক্ষা।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. চৈতন্যদেবের ধর্মমত সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখুন।

.....

.....

.....

## ৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আলোচ্য বিভাগে ব্যাখ্যাত হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা-প্রসঙ্গ। এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে শিক্ষাষ্টক প্রসঙ্গ। শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক ভক্তগণের শিক্ষা হেতু মহাপ্রভু যে আটটি শ্লোক রচনা করেছেন সে বিষয়ে আপনারা এই বিভাগে অবগত হবেন।

## ৬.২ শিক্ষাষ্টক

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনাকালে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার বিস্তারিত বর্ণনা করাই ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের মুখ্য পরিকল্পনা। পূর্ববর্তী চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁর "চৈতন্য ভাগবত " গ্রন্থে সূত্রাকারে শ্রীচৈতন্যের সমগ্র লীলার উল্লেখ করলেও মহাপ্রভুর অপার অনন্ত লীলার বিস্তারিত বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা শেষ পর্যন্ত অবর্ণিতই থেকে যায়। শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলামৃত আস্বাদনে আগ্রহী বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কৃষ্ণদাস নতুন করে শ্রীচৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত রচনাকালে বৃন্দাবন দাসের অকথিত শ্রীচৈতন্যের শেষ বারো বৎসরের

লীলাকথামৃত বাঙালিকে উপহার দেন।

শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীচৈতন্য অনেক সময়ে প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। মহাপ্রভুর সেই অপার্থিব ও ভাগবত জীবন কথার গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন কৃষ্ণদাস।

যে মহাপ্রভু আচণ্ডাল দ্বিজে নাম বিতরণ করেছেন, নাম ও প্রেম বিতরণই যাঁর আবির্ভাবের মুখ্য বহিরঙ্গ কারণ, তিনি কিন্তু কাউকে মন্ত্রশিষ্য করেননি। তবে শেষ জীবনে তিনি আটটি শ্লোক রচনা করেছেন। বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তা ' শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত। এই শিক্ষাষ্টক মহাপ্রভু নীলাচল বাসকালে অর্থাৎ শেষ বয়সে রচনা করেছেন। শেষ বয়সে মহাপ্রভু অষ্টসাত্ত্বিকভাবে বিহ্বল থাকতেন। —

"নানাভাবে উঠে প্রভুর — হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ।।
সেই- সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা।।"

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর স্বরচিত শ্লোকের অর্থাস্বাদন এবং সেই প্রসঙ্গে কৃষ্ণনাম - কীর্তন মাহাত্ম্য বর্ণন ও প্রলাপাদি বর্ণিত হয়েছে।

"হর্ষে প্রভু কহে — শুন স্বরূপ রামরায়!
নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।।"

হর্ষভাবের উদয়ে মহাপ্রভু রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরকে বলেছেন, কলিযুগে শ্রী শ্রী নাম-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

প্রতি যুগেই সাধনের উপায় আছে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজা হল সেই উপায়। আর কলিযুগে হীনশক্তি, অল্পায়ু, অসংযমী জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হল নাম-সংকীর্তন। তাই বলা হয়েছে —

" হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

কলিযুগে যজ্ঞ করতে হলেও তা হবে নামযজ্ঞ। মহাপ্রভু তাঁর স্বরচিত প্রথম শ্লোকটিতে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বকে, হরি-সংকীর্তনের মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিনামের অপূর্ব ফলশ্রুতিকে তুলে ধরেছেন।—

**১ ম শ্লোক** —

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্।"

অর্থাৎ, যা মানসদর্পণের মালিন্য দূর করে, যা সংসার দাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে, যা জীবের মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্নালোক বিতরণতুল্য, যা পরম বিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, যা শ্রবণে আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হয়, যার প্রতি পদে অমৃতের আস্বাদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, যা সর্বাত্মক-তৃপ্তিজনক সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তন জয়যুক্ত হোক।

বৈষ্ণব দর্শন মতে নাম এবং নামী অভেদ। যেখানে নাম সেখানেই নামীর উপস্থিতি। নাম হচ্ছে মহামন্ত্র । শুধু তাই নয়, নামের মধ্যে এত শক্তি রয়েছে যে, যদি কেউ হেলা বশত তাঁর নাম গ্রহণ করে তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে তাঁর হৃদয় - ছাড়া করতে পারেন না।

আবার যে তাঁর নাম গ্রহণ করে অগ্রসর হয়, স্বয়ং ভগবান তাঁর পেছনে বৎসের পেছনে যেমন গাভী ধাবিত হয় ঠিক তেমনি ধাবিত হন। নামের অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে ---

"একবার রাম নামে যত পাপ হরে।

পাতকিয়ে তত পাপ করিতে না পারে।।"

নামের অসাধারণ কৃপা, নামে অপরাধ খণ্ডন হয়। নামাক্ষর অপ্রাকৃত চিন্ময় , তা প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হলেও তা পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত চিন্ময় ; সর্ব বেদ হতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক ; সর্বতীর্থ হতে , সমস্ত সৎকর্ম হতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক; নামের সর্বশক্তিমত্তা রয়েছে। নাম ভগবানের প্রীতি উৎপাদনকারী। নামেই শ্রীভগবান বশীভূত হন, নামই পরম পুরুষার্থ। নাম পরমধর্ম, সর্বমহাপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির প্রকৃষ্ট উপায় হল নাম-সংকীর্তন। এই সংকীর্তনের দ্বারা চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, প্রেমামৃত আস্বাদন হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে এবং কৃষ্ণসেবারূপ অমৃত-সাগরে ডুবে পরমানন্দ লাভ হয়।

হর্ষ ভরে নাম-সংকীর্তনের মহিমা-কীর্তন করতে করতে ভক্ত ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর অন্তরে বিষাদ ও দৈন্য ভাবের উদয় হল, এবং তিনি স্বরচিত অপর একটি শ্লোক পাঠ করলেন। —

**২ য় শ্লোক** —

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি --

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশীঃ তব কৃপা ভগবন্ মমাপি

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"

অর্থাৎ, হে ভগবান, তোমার এরূপ কৃপা যে তোমার নাম-সমূহে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি বহুধা অর্পিত রেখেছ এবং ওই সকল নাম নিত্য স্মরণ নিমিত্ত আমাকে অনেক সময়ও দিয়েছ, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এমনই যে , ওই নামে আমার অনুরাগ জন্মাল না।

মানুষের রুচি , বাসনা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নামও সেই কারণে অনেক। জীবের প্রতি কৃপাবশতই তাঁর নামাধিক্য। নিজ নিজ ইচ্ছা মতো ভক্ত তাঁর নাম গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলেছেন — ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও অভিপ্রায় জেনে প্রত্যেকের অভিপ্রায় ও রুচি অনুযায়ী পরম করুণ ভগবান নিজের বহুবিধ নাম প্রকটিত করেছেন। এই সমস্ত নামে তিনি নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করেছেন — তাঁর যে কোনো নামই তাঁরই ন্যায় অনন্ত-অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ; আবার এ-সমস্ত নাম গ্রহণের জন্য দেশ কালাদির কোনো ভেদও তিনি রাখেননি — যে কোনো লোক যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে তাঁর যে কোনো নাম গ্রহণ করলেই সিদ্ধকাম হতে পারে। এর অপেক্ষা জীবের প্রতি ভগবানের করুণার দৃষ্টান্ত আর কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁর এত কৃপা সত্ত্বেও — এত সুযোগ করে দিলেও মহাপ্রভুর এমনই দুর্ভাগ্য যে, ভগবানের নামে তাঁর অনুরাগ জন্মাল না — তিনি নাম করতে পারলেন না — ফলে নামের ফল হতেও বঞ্চিত হয়ে রইলেন। নাম গ্রহণের কোনো বিধি নিষেধ না থাকলেও ঠিক কীভাবে নাম গ্রহণ করলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা সম্ভব, তার লক্ষণ মহাপ্রভু অপর একটি শ্লোকে বলেছেন ----

**৩ য় শ্লোক —**

" তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

অর্থাৎ — যে তৃণের চেয়ে ও নিচু হয়ে, বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হয়ে, নিজে নিরভিমান হয়ে অমানীকে মান দেয় সেই সর্বদা হরির নাম কীর্তনে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

উত্তম হয়েও নিজেকে তৃণাধম ভাবতে হবে এবং বৃক্ষের মতো দুই রকম সহিষ্ণুতার অধিকারী হতে হবে। অন্যের দেওয়া দুঃখ সহ্য করার এবং প্রকৃতিদত্ত দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাই বৃক্ষের দুইরকম সহিষ্ণুতা। বৃক্ষকে কাটলেও বাধা দেয় না, শুকিয়ে গেলেও জল প্রার্থনা করে না। অথচ দানের ক্ষেত্রে সে অকৃপণ। নিজে রোদ বৃষ্টি সহ্য করে অপরকে সে আশ্রয় দেয়। নিজে সর্বোত্তম হয়েও নিরভিমান হতে হবে। প্রতিটি জীবের অন্তরেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, সুতরাং জীব-মাত্রের প্রতিই সম্মান - প্রদর্শন কর্তব্য। এইরূপে যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন তাঁরই শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমের সঞ্চার হয়।

এ কথা বলতে বলতে ভক্ত ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর চিত্তমধ্যে দৈন্য উপস্থিত হল এবং কৃষ্ণের চরণে তিনি শুদ্ধাভক্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন। যাঁর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বর্তমান তিনিই অনুভব করেন যে শ্রীকৃষ্ণে তাঁর প্রেমের লেশমাত্রও নেই ; প্রকৃত প্রেমের স্বভাবই এরূপ।

**৪ র্থ শ্লোক —**

"ন ধনং ন জনং সুন্দরীং

কবিতা বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

অর্থাৎ , হে জগদীশ, আমি তোমার নিকট থেকে ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবিতা চাই না ; তোমার প্রতি যেন জন্ম জন্মান্তরে আমার অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি থাকে -- এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যের একমাত্র অভীষ্ট অহৈতুকী ভক্তি, অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তি । যে ভক্তির পেছনে কোনো হেতু নেই , কোনো কামনা নেই সেই হল অহৈতুকী ভক্তি। বৈষ্ণবীয় ভাষায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাই যে ভক্তির মূল উদ্দেশ্য সেই হল অহৈতুকী ভক্তি , নিষ্কাম ভক্তি।

যে ভক্তিতে হেতু আছে তা হল কৈতব ভক্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষ, তাও বৈষ্ণব মতে কৈতব প্রধান ভক্তি। কারণ, বৈষ্ণবেরা মুক্তি কামনা করেন না, জন্ম জন্মান্তরে তাঁরা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে থাকতে চান । আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। যে ভক্তি নিবেদনের কোনো হেতু নেই , যে ভক্তি বিনিময়ে প্রেমভক্তির গাঢ়তা ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করে না, সেই অহৈতুকী নিষ্কাম অকৈতব ভক্তিকেই বলা হয়েছে শুদ্ধাভক্তি --- যা শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণের চরণে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

অতঃপর দৈন্যভাব বৃদ্ধি বশত মহাপ্রভু নিজেকে একান্ত ভাবে মায়াবদ্ধ জীব বলে মনে করে অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করলেন। ---

**৫ ম শ্লোক** —

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং

পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বধৌ।

কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ

স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।"

অর্থাৎ, হে নন্দ নন্দন , বিষম সংসার - সমুদ্রে পতিত তোমার কিঙ্কর এই আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য মনে করো।

মহাপ্রভু নিজেকে মনে করছেন যে তিনি মায়াবদ্ধ জীব। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস — কিন্তু তা ভুলে, কৃষ্ণকে ভুলে, তিনি সংসার সমুদ্রে পতিত হয়ে বিষম খাচ্ছেন। তাই অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে তিনি কৃষ্ণ চরণে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তলে ধূলি হয়ে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করে কৃতার্থ হতে চেয়েছেন।

যে মহাপ্রভু স্বয়ং অবতার, যিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান তিনি তো সংসারী জীব নন। তবে তাঁর এত আকুলতা কেন? যিনি প্রেমের অবতার, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে যিনি নাম ও প্রেম বিলিয়েছেন, সেই জীবকুলকে রক্ষার নিমিত্ত মায়াবদ্ধ সংসারী জীবকে ভগবৎ - চরণে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ অভিমান প্রকট করেছেন।

কৃষ্ণ সেবার প্রার্থনা করেই প্রভুর মনে হয়েছে যে, প্রেম গদগদকণ্ঠে শ্রীনাম-সংকীর্তন করতে না পারলে তো কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না , তাই তিনি অত্যন্ত দৈন্য এবং উৎকণ্ঠার

সঙ্গে সপ্রেম-নাম-সংকীর্তনের সৌভাগ্য প্রার্থনা করলেন।

**৬ ষ্ঠ শ্লোক** —

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া

বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা

তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।"

অর্থাৎ -- হে ভগবান , কবে সেই দিন আসবে, যেদিন তোমার নাম গ্রহণ করতে করতে আমার চোখ জলে ভেসে যাবে, গদগদবাক্যে মুখের কথা রুদ্ধ হয়ে আসবে, এবং পুলকে অঙ্গ পরিব্যাপ্ত হবে।

যার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন বা শ্রীকৃষ্ণসেবাসৌভাগ্য নেই, জীবনে সে নিতান্তই দরিদ্র ও ব্যর্থ। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে তোমার সেবাকার্যে দাসরূপে নিযুক্ত করো, তোমার প্রেমধনই হবে এই দাসের বেতন।

প্রেমধনের কথা বলতে বলতেই হঠাৎ প্রভুর ভক্তভাব অন্তর্হিত হল, আবার প্রভু কৃষ্ণ - বিরহাকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হলেন। এই বিরহের ভাব স্ফুরিত হওয়ায় প্রভুর চিত্তে উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যাদি - ভাবের উদয় হল এবং তিনি স্বরচিত সপ্তম শ্লোকটি পাঠ করে প্রলাপ করতে লাগলেন —

**৭ম শ্লোক** —

"যুগায়িতং নিমেষণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূণ্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ।"

অর্থাৎ — গোবিন্দের বিরহে একটি নিমেষই আমার কাছে যুগবৎ বোধ হয়, চোখের জলে বর্ষার ধারা, আর সমগ্র জগৎ একান্ত শূন্য বলে মনে হয়। কৃষ্ণ বিরহে আমার হৃদয় তুষানলের মতো জ্বলছে। প্রাণ বের হয়ে গেলেও এই অসহ্য জ্বালা হতে নিষ্কৃতি পেতাম।

এক সময়ে শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা রাধাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সখিগণ শ্রীরাধাকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা দেখাবার জন্য উপদেশ দেন। সখিগণের এইরূপ উপদেশের কথা চিন্তা করতে করতে শ্রীরাধার চিত্তে প্রেমের সঞ্চারী ভাবসমূহ উদিত হয় --- ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রগল্‌ভতা, বিনয় -- একই সঙ্গে শ্রীরাধার চিত্তে এসকল ভাবের উদয়ে স্বাভাবিক প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখা দিল। এই অবস্থায় শ্রীরাধা নিজের অস্থির মনের ভাব সখীদের কাছে একটি শ্লোকে প্রগল্‌ভতার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন ।

শ্রীরাধাভাবে - ভাবিত মহাপ্রভু সেই প্রগল্‌ভতার সঙ্গেই তাঁর সর্বশেষ শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন ---

**৮ম শ্লোক —**

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা --

মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ।।"

অর্থাৎ -- হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পদদাসী আমাকে আলিঙ্গন দ্বারা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে আমাকে মর্মাহতই করুন , অথবা সেই বহুবল্লভ যত্র তত্র বিহারই করুন , তিনি যাই করুন না কেন , তিনি আমার প্রাণনাথই , প্রাণনাথ ব্যতীত অপর কেউ নন।

শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে এই যে শ্লোকটি পাঠ করেছেন, তার অর্থ এত সুবিস্তৃত যে গ্রন্থকার দীনতার সঙ্গে জানিয়েছেন ----

"এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার।

সংক্ষেপে কহিয়ে, তার নাহি পাই পার।।"

অতি সংক্ষেপে গ্রন্থকার এর অর্থ প্রকাশ করেছেন এক ত্রিপদীতে ---

যাই ঘটুক যেমনই ঘটুক, তবু আমি কৃষ্ণের পদদাসী, তিনিই আমার পরম প্রিয় প্রাণনাথ। আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি সত্যিই তিনি সুখী হন, তবে আমার সেই অসীম দুঃখই আমার অনন্ত সুখ। কৃষ্ণকান্তাগণ যে কৃষ্ণের উপর মান করেন সে তো কেবল তাঁরই সুখের জন্য, এবং মান যে পরিত্যাগও করেন সেও তাঁরই সুখের জন্য। যে নারী স্বসুখ কামনায় কৃষ্ণের প্রতি রোষ প্রকাশ করে তার মরণই ভালো। আমি শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত অন্য কিছু চাই না। আমার প্রতি বিদ্বেষ - ভাবাপন্ন কোনো গোপী যদি শ্রীকৃষ্ণেব অভিলাষ ও সন্তোষের কারণ হয়ে থাকে তো আমি সেই গোপীর ঘরে দাসী হয়েও সুখানুভব করি। কুষ্ঠ - ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নীর পাতিব্রত্য এমনই মহান ছিল যে স্বামীর সন্তোষের জন্য তিনি বেশ্যার ঘরে গিয়ে সেই বারাঙ্গনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। সেই পাতিব্রতা শিরোমণির পাতিব্রত্যের মহিমা এমনই ছিল। হে সখি , কৃষ্ণই আমার জীবন, প্রাণসর্বস্ব। জীবনভোর শুধু আমার একটিই সাধনা -- কেমন করে সেবার দ্বারা আমি তাঁকে সুখী করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের সুখের কারণেই আমার এই দেহ তাঁর ক্রীড়াসামগ্রীরূপে সমর্পণ করি। তিনি আমাকে তখন কান্তার ন্যায় গ্রহণ করে প্রাণেশ্বরী বলে সম্বোধন করলেও, আমি তখনো নিজেকে তাঁর দাসীরূপেই অনুভব করি। সঙ্গমসুখ অপেক্ষা সেবাসুখই মধুর এবং অধিকতর পরিতৃপ্তিকর। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী প্রেয়সী হয়েও বিহারাদি অপেক্ষা পাদপদ্মসেবাকার্যেই তাঁর অধিকতর তৃপ্তি ও আকর্ষণ।

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ; রস - স্বরূপে তিনি আস্বাদ্য আবার তিনি রসের আস্বাদকও। তিনি আনন্দঘন বিগ্রহ মূর্তি। সেই রস ও আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে, তাঁর রসাস্বাদনের বৈচিত্র্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি যখন যে কার্যই করুন না কেন, তাতে যদি প্রবল বেদনারও সঞ্চার হয় তথাপি তাঁর কার্যের আনুকূল্য বিধান করে তাঁকে সুখী করবার চেষ্টা

করাই তাঁর দাসীর কর্তব্য, তাতেই সেবার আনন্দ, তৃপ্তি। কারণ শ্রীরাধার প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাকেই একমাত্র সেবা বলে জানে। তাই সেই প্রেম হতে তিনি সুখ-দুঃখ যাই পান-না কেন তবু শ্রীকৃষ্ণ একান্তই তাঁর প্রাণবল্লভ ; বহুবল্লভ হলেও রাধা তাঁকেই একমাত্র প্রাণনাথ বলে জানেন, তাই সর্বতোভাবে তাঁর সুখবিধান করাই তাঁর সেবা , কর্তব্য এবং তৃপ্তি।

" কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখি করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ।।"

এই প্রেমই বৈষ্ণবের একান্ত কামনার ধন। নিজের সুখ - দুঃখ , ধর্ম - কর্ম , ভালো - মন্দ ইত্যাদি সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে দাসীর ন্যায় সেবা করে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোতভাবে সুখী করার চেষ্টাই ব্রজপ্রেমের একমাত্র তাৎপর্য।

এই আটটি শ্লোকের এক ধারাবাহিকতা রয়েছে। জীবের পক্ষে যার কথা যা শিক্ষণীয়, তাই এই শিক্ষাষ্টকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথম শ্লোকে নাম-কীর্তনের অপূর্ব মাহাত্ম্য কীর্তন করে পরম করুণ মহাপ্রভু মায়াবদ্ধ জীবকে নাম-সংকীর্তনে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছেন; কারণ এই নাম-সংকীর্তনই কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি জানিয়েছেন এই নাম-কীর্তনের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, প্রত্যেকেই স্বীয় অভিরুচি ও অভিলাষ-অনুসারে ভগবানের যে কোনো নাম কীর্তন করতে পারে। প্রত্যেক নামেই যাতে অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়, সেজন্য স্বয়ং ভগবান প্রত্যেক নামেই স্বীয় সমগ্র অচিন্ত্য শক্তি বিভাগ করে অর্পণ করেছেন। এই নাম-গ্রহণের কোনো বিশেষ নিয়মও নেই। ভগবানের নামের অনন্ত ফল কীর্তিত হলেও নাম-কীর্তনের মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তি। এর জন্য প্রয়োজন বৈষ্ণবোচিত বিনয়, এবং ঈশ্বরের নিকট জীবের প্রার্থনা কোনো পার্থিব কামনা-বাসনা-সুখ-ঐশ্বর্য নয়, মায়াবদ্ধ জীবের একমাত্র প্রার্থনা হবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে অচলা অহৈতুকী ভক্তি। নিত্যদাসরূপে জীব তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা তাঁর চরণ-সেবা করার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাবে। এইরূপে নাম কীর্তন করতে করতে, কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা করতে করতে নয়নে অশ্রুধারা বইবে, চিত্ত পুলকিত হবে, বাক্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। তখনই জীবের চিত্তে জাগবে বৈষ্ণবীয় বিনয়, অন্তরে আবির্ভূত হবে কৃষ্ণপ্রেম। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য সাধকের উৎকট লালসা জাগবে, কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর সমস্ত জগতই শূন্য বলে অনুভূত হবে। প্রেমের এই হল চূড়ান্ত রূপ। যে পথে এই পরম প্রেম লাভ করা যায়, সে-পথের দিশা দেখিয়েছেন মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শিক্ষাষ্টক শ্লোকের কেবল আক্ষরিক অনুবাদই করেননি; তাঁর বর্ণনাগুণে তা হয়ে উঠেছে একাধারে অনুবাদ, অনুসৃষ্টি আবার সংস্কৃত শ্লোকের ভাষ্য।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ - ১**

**প্রশ্ন :** —শিক্ষাষ্টকের ৪ নং শ্লোকে মহাপ্রভু বলছেন " ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতা " ইত্যাদি, অর্থাৎ কবিতাকে তিনি চাননি, অথচ " চৈতন্য-চরিতামৃতে" স্পষ্ট উল্লিখিত রয়েছে ---

" স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনার সনে।
রাত্রি-দিনে রসগীত শ্লোক - আস্বাদনে।।"

— এর কারণ কী ?

**উত্তর :** — শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে মহাপ্রভু স্পষ্ট বলেছেন, তিনি যেমন ধনজন চান না , তেমনি কবিতা সুন্দরীকেও চান না। শুদ্ধাভক্তির পথে এই সকল বাধা সৃষ্টি করে। ধন-জন-কবিতাদির প্রার্থনায় স্বীয় ভোগ-সুখই লক্ষ্য থাকে, যা শুদ্ধা-ভক্তির প্রতিকূল।

উদ্ধৃতাংশে কবিতা বা কবিত্বশক্তির দ্বারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত কবিতা বা কবিত্ব শক্তিকেই নির্দেশ করেছেন।

আলোচ্য শ্লোকে মহাপ্রভু অহৈতুকী ভক্তি কামনা করেছেন। এই অহৈতুকী ভক্তির সাধন সহায়ক হল অপার্থিব বৃন্দাবনলীলা শ্রবণ এবং কীর্তন।

পদাবলিতে এক অপার্থিব কেন্দ্রীভূত উপাদান আছে। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেমিক ভক্ত। তাঁরা কেবল শ্রুতি বিনোদন কাব্য রচনা করেননি, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রীতিরস বর্ণনাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। প্রীতিরসে শ্রীভগবানের সাধন-প্রণালী

প্রদর্শন ও রসাস্বাদ --- এই দুই উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টভাবেই পদাবলি সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। সাধারণ প্রীতি-রসের কাব্য থেকে পদকাব্যের বৈশিষ্ট্য হল যে, পদাবলি মানুষের চিত্তে অতি মধুরভাবে ভজন পদ্ধতির শিক্ষা সঞ্চার করে। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মহাপ্রভাব পদাবলিতে মধুরভাবে বর্ণিত থাকায় পদাবলি শ্রবণে, কীর্তনে ও স্মরণে যে আনন্দ চমৎকারিত্ব জাগে, তা অন্য প্রকারে বাস্তবিকই অসম্ভব। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রধানত কাব্য রচনার উদ্দেশ্যে পদাবলি রচনা করেননি, কৃষ্ণলীলা স্মরণ, মনন ও আস্বাদনের জন্যই তাঁদের এই প্রচেষ্টা। তাই তাঁদের পদাবলি রচনার পেছনে বৃথা গর্ব ও বৃথা আবেশ মাত্র নেই, আছে কেবল কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি আস্বাদন। তাই মহাপ্রভু অহৈতুকী ভক্তির কথা বলতে গিয়ে পার্থিব কবিতা বা কবিত্ব শক্তিকে পরিহার করলেও জীবনের শেষ পর্যায়ে 'স্বরূপ-রামানন্দ-সনে' চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি আদির রচিত কাব্য আস্বাদন করেছেন, কারণ তা অপ্রাকৃত, ঈশ্বরের অপ্রাকৃতপ্রেমলীলার উৎসস্থল --- তা মহাপ্রভুর একান্ত কাম্য। সেজন্য দিবারাত্র বিভোর হয়ে মহাপ্রভু এই অপার্থিব লীলা সংক্রান্ত কাব্য আস্বাদন করেছেন। কিন্তু পার্থিব বিষয়ক যে প্রাকৃত কাব্য বা কবিত্বশক্তি তা তিনি কামনা করতে পারেন না বা কামনা করেননি।

**প্রশ্ন :** রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনাকালে মহাপ্রভুর কথায় যখন রায় রামানন্দ বলেছেন --- "দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার" তখন মহাপ্রভু বলেছেন ---

"এহো হয়, আগে কহ আর।" এবং মহাপ্রভুর কথায় প্রেমের অধিকতর পরিপক্ক অবস্থার কথা রায় রামানন্দ বর্ণনা করেছেন --- " কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার" --- রামানন্দের কথা মহাপ্রভু সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন ; কিন্তু শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে মহাপ্রভু স্বয়ং --- " অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্য ভক্তিদান" ---- এর কারণ কী? মহাপ্রভুর দর্শন এবং কর্মে কোনো বিরোধ আছে কী?

**উত্তর :** শিক্ষাষ্টকে জন্ম-জন্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করতে করতে মহাপ্রভুর চিত্তে দৈন্যভাব বৃদ্ধি পায়। উদ্‌ঘূর্ণা বশত ভক্তভাবে তিনি মনে করেছেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীব এবং "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। কিন্তু মহাপ্রভু মনে করেছেন, দুর্ভাগ্যবশত তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভুলে তিনি মায়ায় আবদ্ধ হয়ে সংসার মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাই কৃষ্ণের চরণে তিনি অত্যন্ত দীনভাবে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃপা করে তাঁকে কৃষ্ণের সেবক করে নেন। সর্বদাই কৃষ্ণের চরণের আশ্রয়ে থেকে তাঁর চরণ-সেবা করে মহাপ্রভু কৃতার্থ হতে চেয়েছেন। অথচ রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনাকালে মহাপ্রভু স্বয়ং দাস্যপ্রেম সম্পর্কে বলেছেন --- 'এহো হয়," এবং চূড়ান্ত রূপে কান্তা প্রেমকে "সর্ব্বসাধ্যসার" বলে মেনেছেন।

কান্তাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি হলেও জীবের নিত্যস্বরূপ হচ্ছে দাসমাত্র। সেজন্য কান্তা প্রেমকে চরম সাধ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিত্যদাস জীব তার দাস্য স্বরূপকে অবলম্বন করেই সখীর অনুগত হয়ে ব্রজের সেই কান্তাপ্রেমের মধুর লীলা রসাস্বাদন করবে -- এটাই বৈষ্ণব-দর্শনের অন্যতম বিষয়। সে কান্তাপ্রেমকে চরম সাধ্য হিসেবে স্বীকার করলেও তার দাস্যস্বরূপকে কখনই বিস্মৃত হবে না।

দ্বিতীয়ত, রামানন্দ কথিত দাস্যপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা এবং দাস্যের সেবাভাব থাকলেও সখ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের লাল্যপাল্যভাব এবং মধুরের আত্মসমর্পণ নেই। তাই তাতে গৌরব বুদ্ধি বর্তমান। এ জন্যই মহাপ্রভু দাস্যকে 'এহো বাহ্য' বলেছেন। কিন্তু জীবের স্বরূপানুবন্ধী যে কৃষ্ণ-দাসত্ব তাকে অস্বীকার করেননি। পূর্ব পূর্ব রসের গুণ কান্তাপ্রেমে বর্তমান, সেজন্য কান্তাপ্রেমকে সর্বসাধ্যসার বলে স্বীকার করলেও জীবের নিত্যদাসত্বকে অস্বীকার করা হয় না।

দাস্যপ্রেমে ভক্ত হন কৃষ্ণগত প্রাণ, নিষ্ঠা এবং সেবাই তাঁর একান্ত সম্বল। দাস্য প্রেমের উৎকণ্ঠা হল — " হে প্রভু, কবে আমি সর্বতোভাবে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে তোমার নিত্যদাস হয়ে সেবার দ্বারা নিজের জীবন ধন্য করবো।" কারণ দাস্যপ্রেমও শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনানুযায়ী প্রেম, যার মূল কথা হল "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা"। আর এই অহৈতুকী প্রেম-ভক্তির লোভে ভক্ত দাস কখনো মুক্তি চায় না, সে জন্ম - জন্মান্তরে কৃষ্ণের চরণ সেবা করে প্রেমধনে ধন্য হতে চায়। নরবপুধারী মহাপ্রভুও নিজেকে তাই দাসরূপেই দেখেছেন ও কৃষ্ণসেবার অধিকার কামনা করেছেন। অতএব, শিক্ষাষ্টকের এই পঞ্চম শ্লোকের বঙ্গানুবাদে মহাপ্রভুর দাস্যভক্তি কামনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ - ২**

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে "শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতিপরিচ্ছেদ"— এ মহাপ্রভু কর্তৃক স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের অর্থ-আস্বাদন এবং সেই প্রসঙ্গে নাম-সংকীর্তন-মাহাত্ম্য ও রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

কলিকালে নামই পরম ধর্ম । নামসংকীর্তনের দ্বারাই কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়।

কথিত আছে 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ'। শ্রীকৃষ্ণেরও তাই অষ্টোত্তর শতনাম। জীবের প্রতি কৃপাবশতই তাঁর নামাধিক্য। নামের মধ্যেই ভগবান তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। তাই যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নাম গ্রহণ করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

নাম গ্রহণে কোন বিধি নিষেধ নেই বটে, কিন্তু ভক্তকে সর্বদা বিনীত, সহিষ্ণু নিরাভিমানী হতে হবে, তবেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমলাভ করবেন।

স্বরচিত শ্লোকাস্বাদন করতে করতে ভক্ত-ভাব বিশিষ্ট মহাপ্রভুর চিত্তে দৈন্য দেখা দিলে তিনি কৃষ্ণের চরণে শুদ্ধাভক্তির জন্য প্রার্থনা জানান।

এই দৈন্যভাব বৃদ্ধি হওয়ায় নিজেকে একান্ত মায়াবদ্ধ জীব ভেবে মহাপ্রভু কৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তির প্রার্থনা জানান।

অতঃপর অধিকতর দৈন্য এবং উৎকণ্ঠাবশত মহাপ্রভু কৃষ্ণের নিকট সপ্রেম নাম-সংকীর্তন প্রার্থনা করলেন।

প্রেমধনের কথা বলতে গিয়ে মহাপ্রভুর চিত্তে ভক্তভাব দূরীভূত হয়ে রাধাভাবের সঞ্চার হল এবং ফলে তাঁর মধ্যে বিরহের স্ফূরণ ঘটে। রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভুর আপন অন্তরের অস্থির ভাব সখীরূপ পরিকরের কাছে প্রগলভতার সঙ্গে একটি শ্লোক উচ্চারণ করেন।

শ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেমবচনামৃত আস্বাদন করে রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভুর দেহে মনেও অশ্রুকম্পাদি নানা প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

স্বসুখ বাসনা মুক্ত বিশুদ্ধ হেম-সম ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম জগতে প্রচার করার জন্যই মহাপ্রভু এই শ্লোকাবলি রচনা করে তার অর্থ-ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাপ্রভুর এই লীলারস আস্বাদনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান যেমন নিতান্তই অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি সেই লীলামৃত সমুদ্রের তল পাওয়া ও অসম্ভব।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. মহাপ্রভু উল্লিখিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

২. মহাপ্রভু উচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

.....

৩. শিক্ষাষ্টকের মাধ্যমে মহাপ্রভু বৈষ্ণব ভক্তগণকে কীরূপ শিক্ষা দিয়েছেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

৪. রাধাভাবে ভাবিত হয়ে মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের কোন শ্লোক উচ্চারণ করেছেন?

.....

.....

.....

.....

## ৬.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম অ-গেয় পাঠ্য গ্রন্থ।

আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা— এই তিন লীলাখণ্ডে সমগ্র গ্রন্থটি বিন্যস্ত। এই গ্রন্থে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ, গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কাব্য কুশলতার এমন আশ্চর্য সমন্বয় জগতের যে-কোন ধর্মগ্রন্থে দুর্লভ।

অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু কর্তৃক স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের অর্থ-আস্বাদন ও সেই প্রসঙ্গে নাম-সংকীর্তন মাহাত্ম্য ও রাধা প্রেমের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত।

মহাপ্রভুর শেষ-জীবনের অপার্থিব লীলা কাহিনি শ্রবণের যে আগ্রহ ভক্ত সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে ছিল তাকেই লেখনি মুখে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কৃষ্ণদাস। মহাপ্রভুর অপার্থিব দিব্যোন্মাদ মনোভাবকে কৃষ্ণদাস যে সূক্ষ্মতম তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিকতা ও অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা তাঁর অসাধারণ মননশীলতা ভাবগভীরতা ভক্তিমিশ্রিত আবেগ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। এই মহাগ্রন্থ একান্তভাবে শুধু চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্যমাত্র নয়; জীবনকথা বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব কথা। ভক্তির সঙ্গে দর্শন, তত্ত্ব , ইতিহাস, রসের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই মহাগ্রন্থে।

## ৬.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

এবার আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক টীকা আলোচনা করব।

**পঞ্চতন্ত্র :** স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ছাড়াও নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অপর চাররূপে আত্মপ্রকট করেন ; সেই চাররূপ হল— বিলাস, অবতার, ভক্ত ও শক্তি। এই চাররূপ সাধারণত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। এই চাররূপ হল চারতত্ত্ব আর স্বয়ংরূপ একতত্ত্ব। এই পাঁচতত্ত্ব— মূল একতত্ত্বই পাঁচতত্ত্বে অভিব্যক্ত। নবদ্বীপ-লীলায় স্বয়ংরূপ নন্দেরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ; তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করেছেন বলে নিজে ভক্তরূপ ; নবদ্বীপে তিনিই মূলতত্ত্ব। নিজের ইচ্ছাশক্তিতে তিনি অপর চারটি তত্ত্ব-রূপেও আত্মপ্রকট করেছেন, সেই চারতত্ত্ব হল— (১) ভক্তস্বরূপ ( কৃষ্ণাবতারের বিলাসরূপ) শ্রীনিত্যানন্দ যিনি পূর্বলীলায় ছিলেন বলদেব সঙ্কর্ষণ ; (২) ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত, যিনি পূর্বলীলায় ছিলেন শ্রীসদাশিব ; (৩) ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং (৪) ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যেমন পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কলিযুগে নবদ্বীপলীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যে সেরূপ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকটিত হয়েছেন তা একটি শ্লোকে উল্লিখিত রয়েছে—

" যদ্বৎপুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোহপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ ।।"

এই পাঁচতত্ত্বের মধ্যে স্বরূপত কোনো ভেদ নেই। তাই বলা হয়েছে—

" পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ।।"

**জ্ঞানমার্গ :** জ্ঞানমার্গের মূল কথা হল ব্রহ্মের স্বরূপকে জ্ঞান-দ্বারা অনুভব করা। শ্রুতি বলেন " ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" -- নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অবগত হতে পারেন, তিনিও ব্রহ্মই হন। জ্ঞানমার্গের আচার্যগণ বলেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্ম হন, তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মের আর কোনো অংশেরই ভেদ থাকে না। ভক্তিমার্গের আচার্যগণ বলেন — ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হন না, ব্রহ্মতুল্য হন।

জ্ঞান ভগবদনুভবের একটি উপায় মাত্র। কিন্তু সকল মানুষ জ্ঞানের অধিকারী নন; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত মানুষই জ্ঞানমার্গের সাধনে অধিকারী। আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানানুশীলনের বিরতি ঘটে। কেবল জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করলেই যে ভগবদনুভব হয় না এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভক্তিকে ত্যাগ করে যাঁরা কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁদের ক্লেশ ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয় না। আরো বলা যায় ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মেই লীন হয়ে যান তবে তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না বলে তাঁর পক্ষে ব্রহ্মের অনুভবজাত আনন্দ লাভ হতে পারে না। জ্ঞানমার্গ অনুসরণে বলা যায়, চিনি হওয়া যায় , কিন্তু চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। এই জ্ঞানমার্গ তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গৃহীত হয় না।

**যোগমার্গ :** যোগমার্গের সাধনা হল আত্মার সাধনা। যোগ সম্পর্কে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— " অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ" — অর্থাৎ, বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা যাঁর মন সংযত হয়নি, তাঁর পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য। যিনি মনকে বশীভূত করতে পারেন, যোগের উপায় অবলম্বন করলে তিনিই সফল রত্ন হতে পারেন। যোগযুক্ত ব্যক্তি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করতে পারে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাঁর আত্মা বা মন সংযত হয়নি, তিনি বিজ্ঞ পুরুষ হলেও যোগ তাঁর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। তবে যোগানুষ্ঠানের জন্যও শুদ্ধস্থানের এবং সুখজনক আসনাদির প্রয়োজন। যোগও ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায় নয়। জ্ঞানী, কর্মী, যশস্বী, মনস্বী, অধিক, সদাচারী ব্যক্তিগণ ভগবানকে স্ব স্ব তপস্যাদি অর্পণ না করলে মঙ্গল প্রাপ্ত হন না। অতএব যোগও স্বীয় ফল প্রদান করতে ভগবদারাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে যোগ তাই ভগবৎ-লাভের চরম উপায় নয়।

**ভক্তিমার্গ :** গীতায় বলা হয়েছে, যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ জেনেছেন, তিনিও যদি ভক্তিযুক্ত না হন, তবে তাঁকে পুরুষাধম বলা হয়। জ্ঞানীকর্ম-যোগেও ভক্তির অপেক্ষা রাখে। কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম, তীর্থযাত্রা, ব্রতাদি দ্বারা যা ফল পাওয়া যায়, কেবল ভক্তি দ্বারাই সেই সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যায়। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হয়েছে —

"ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল।

সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।।"

ভক্তি অহৈতুকী। ভক্তি থেকেই ভক্তির উন্মেষ, এর জন্য ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তাই হলা হয়েছে —

" জ্ঞান - বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ"।

যে কোনো লোক, যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময়ে, যে কোনো অবস্থায় ভক্তির সাধন অনুষ্ঠান করতে পারেন। জ্ঞান যোগাদির ন্যায় সিদ্ধিলাভে অর্থাৎ ভগবদ্-সেবা প্রাপ্তিতেও ভক্তির বিরতি নেই। ভক্তিমার্গের সাধক সিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামেও ভক্তির দ্বারা ভগবদ্-সেবা করেন। একমাত্র ভক্তিই ভগবদ্-লাভের অন্যতম উপায়।

গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন যে— শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পিত একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত হন ভগবান। এই ভক্তি অন্য কোনো সাহচর্যের অপেক্ষা রাখে না।

ভগবানের মাধুর্যানুভবই যথার্থ অনুভব। এই মাধুর্য অনুভবের একমাত্র উপায় হল প্রেম। —

"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।

কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।।" —

এই প্রেম লাভের একমাত্র উপায় ভক্তি। সুতরাং ভক্তিই ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদনুভবের একমাত্র উপায়। গীতাতে ভগবান বলেছেন — " স্বরূপও আমি যেরূপ, আমার বিভূতি ও গুণাদি যা কিছু আছে নির্গুণা ভক্তির দ্বারাই তা বিশেষরূপে জানা যায়। ... ভক্তি থেকে আমার সম্পর্কে যাথাত্ম্য বস্তুজ্ঞান জন্মালে জীব আমার সঙ্গে

যুক্ত হতে পারে অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করতে পারে।" অবস্থাবিশেষে জ্ঞান-যোগাদির দ্বারাও ভগবদনুভব হয় বটে, কিন্তু যথার্থ অনুভব বা মাধুর্যের অনুভব হয় না। শ্রীভগবান একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত— কর্ম, জ্ঞান যোগাদির বশীভূত নন। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

"ঐছে শাস্ত্র কহে --- কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যাজি।

ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।।"

ভক্তিও আবার সাধারণত দুই প্রকার — ঐশ্বর্য জ্ঞানময়ী ভক্তি এবং ঐশ্বর্য জ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তি। ঐশ্বর্য জ্ঞানময়ী ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্য জ্ঞানময় প্রেমের উদ্ভব হয়, তার ফলে সাধক সারূপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে যেতে পারেন এবং শ্রীভগবানের নারায়ণ স্বরূপের সেবা করতে পারেন। আর ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা কেবলা-ভক্তিতে ব্রজপ্রেম লাভ হতে পারে এবং মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সেবালাভ হতে পারে। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের মাধুর্য অনেক বেশি। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের এমনই এক স্বাভাবিকী শক্তি আছে যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত চঞ্চল করে তোলে। এই অসমোর্ধ্ব মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় — শুদ্ধনির্মল ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবল, প্রেম, যা একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি থেকেই লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ অনুভবের একমাত্র উপায়।

**অবতার তত্ত্ব :** অবতার তিন রকম — অংশাবতার, গুণাবতার এভং শক্ত্যাবেশ - অবতার। অংশাবতারকে স্বাংশও বলে। এঁরা স্বয়ং রূপেরই অংশ, অবশ্য স্বয়ংরূপ বা বিলাসরূপ অপেক্ষা অল্প শক্তিই এঁদের মধ্যে বিকশিত হয়। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিনপুরুষ আর মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার— অংশাবতার। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদশায়ী থেকে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আবির্ভূত হন। সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠাতা বলে এঁদের গুণাবতারও বলা হয়। যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চার করে ভগবান ব্রহ্মা ও শিবের কার্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহার করান। এরূপ ব্রহ্মাকে জীবকোটি ব্রহ্মা এবং শিবকে জীবকোটি শিব বলে— এঁরা আবেশাবতার। দ্বিতীয় পুরুষের অংশ যাঁরা তাঁরা ঈশ্বরকোটি।

জ্ঞানশক্ত্যাদির বিভাগ দ্বারা ভগবান যে- সব জীবে আবিষ্ট হয়ে থাকেন, তাঁদের শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। নারদ, সনকাদি ঋষ্যদেবাদি এই অবতার।

এই ত্রিবিধ অবতারের মধ্যে অংশাবতারগণ এবং ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব— এঁরা সকলেই ভগবানের স্বরূপের অংশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অংশে এই কয়েকটিরূপে বিলাস করেন। আর শক্ত্যাবেশ অবতারে যাঁদের মধ্যে শক্তির আবেশ হয় তাঁরা স্বরূপত ভক্ত। এ সকল ভক্তের দেহে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শক্তিরূপে বিলাস করেন।

সৃষ্টিকার্যের জন্য ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাঁকে অবতার বলে।

স্বয়ং ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান— চিচ্ছক্তি, তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ শক্তিও বলা হয়। তটস্থা শক্তি হল

জীবশক্তি ; অনন্তকোটি জীব এই জীবশক্তিরই অংশ। মায়াশক্তিকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। কিন্তু শক্তি শক্তিমানের অভেদবশত ভগবানের শক্তিতেই মায়া শক্তি লাভ করে। কিন্তু এই বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে ভগবান সাক্ষাৎভাবে কোনো লীলাই করেন না। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করেন। মায়াতে শক্তি সঞ্চার করে ইনি ব্রহ্মাণ্ডকে এবং অনন্তকোটি জীবকে সৃষ্টি করেন। তাই তাঁকে আদি দেব বা আদি অবতারও বলা হয়।

**প্রেমরূপ-কৃষ্ণ-ভক্ত :** শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। সকল জীবই আনন্দ চায়। সুতরাং রস বা আনন্দই হল তত্ত্ব বস্তু। রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পেলেই জীব আনন্দ লাভ করতে পারে। তাই আনন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণের সঙ্গেই আনন্দ-লিপ্সু জীবের নিত্যসম্বন্ধ। তাই কৃষ্ণকে সম্বন্ধ তত্ত্ব বলা হয়েছে।

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে হলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হল প্রেম। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। এজন্য শাস্ত্রে প্রেমকে বলা হয়েছে প্রয়োজন তত্ত্ব।

আবার প্রেম লাভ করতে হলে ভক্তি সাধনই জীবের একমাত্র কর্তব্য। কারণ ভক্তি ছাড়া প্রেমের বিকাশ হয় না। তাই সাধন ভক্তিকেই অভিধেয় তত্ত্ব বলা হয়েছে। অভিধেয় অর্থ কর্তব্য।

সম্বন্ধ তত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব এবং প্রয়োজন তত্ত্ব— এই ত্রিবিধ তত্ত্বই হল জীবের মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। এই ত্রিবিধ জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান এবং মুখ্যবস্তু আনন্দের সঙ্গে এরা অপরিহার্য ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এ তিনটিকে বলা হয় তত্ত্ব বস্তু।

কৃষ্ণভক্তির তিন অবস্থা— সাধনভক্তি, ভাবভক্তি এবং প্রেম ভক্তি। সাধনাবস্থায় যে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তার নাম সাধনভক্তি। সাধনভক্তির পরিপক্ক অবস্থার নাম ভাব-ভক্তি। সাধনভক্তি থেকেই ভাবভক্তির উদয় হয়। ভাবভক্তির পরিপক্ক অবস্থার নাম প্রেম বা প্রেমভক্তি। সুতরাং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তির অর্থ হল কৃষ্ণভক্তির পরিপক্কাবস্থা প্রেমভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষই হল প্রেম। সুতরাং প্রেম স্বরূপতই আনন্দ। সাধনাবস্থায় নাম-সংকীর্তন সাধনভক্তির অঙ্গ। নাম ও নামীর অভেদবশত আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনামের ভেদ নেই। এই নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমেই ভক্তের হৃদয়ে ভাবভক্তি সঞ্চারিত হয়, এবং এই ভাবভক্তি গাঢ়তর অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তির রূপ পরিগ্রহ করে।

**ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান :** শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তিনি বিভু, অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব এবং স্বরূপে, শক্তিতে ও শক্তির কার্যে— ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনাদিদেব তিনি সকলের আদিমূল। প্রকাশ বিশেষে বা আবির্ভাব-ভেদে তিনি তিনটি নাম ধারণ করেন— ব্রহ্ম, আত্মা, এবং ভগবান। স্বয়ং, রূপ শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান তাঁরই আবির্ভাব বিশেষ।

ব্রহ্ম হল কেবল জ্ঞান মাত্র। পরতত্ত্বের ধর্ম তাঁর শক্তিবর্গ দ্বারা লক্ষিত হয়। পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তির কোনো ক্রিয়া লক্ষিত হয় না স্পষ্টভাবে, যা চিৎ-সত্তা বা আনন্দ সত্তা

মাত্র তাই ব্রহ্ম। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। কিন্তু তাঁর আবার অনন্ত স্বরূপও আছেন, অর্থাৎ শক্তি কার্যের তারতম্য অনুসারে তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করেছেন। এ সকল অনন্ত স্বরূপের মধ্যে এমন একটি স্বরূপ আছেন, যাঁর মধ্যে তাঁর অনন্ত শক্তির মধ্যে একটি শক্তির লক্ষণও স্পষ্ট প্রকাশিত নয়। এটি শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ স্বরূপ অর্থাৎ এঁর এমন কোনো গুণ বা বিশেষণ নেই, যার দ্বারা এই স্বরূপের পরিচয় দেওয়া যায়। এঁর রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নাই ; এই স্বরূপটি কেবল চিৎ সত্তা বা আনন্দ সত্তা মাত্র অর্থাৎ আনন্দ বৈচিত্র্যহীন কেবল আনন্দ রূপে তা বিরাজিত। এই নির্বিশেষ স্বরূপই ব্রহ্ম। জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদীগণ এই নির্বিশেষ স্বরূপেরই অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসক।

আত্মা বা পরমাত্মা হলেন অন্তর্যামী। অন্তর্যামী তিন ধরনের— (১) সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ; (২) ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী পুরুষ ; এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ পুরুষ। এঁরা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট। এঁরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিভূতি। এঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাংশ সুতরাং চিচ্ছক্তি বিশিষ্ট ; কিন্তু মায়িক সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে এঁদের সংস্রব আছে বলে মায়া শক্তি নিয়েও এঁদের কাজ। কিন্তু তথাপিও এঁরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাংশ , তাই এঁরা মায়াতীত, মায়া শক্তির নিয়ন্তা মাত্র। অন্তর্যামী ত্রিবিধ হলেও আত্মা বা পরমাত্মা বলতে কেবল ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামীকে বোঝায়। ইনি যোগমার্গের উপাস্য।যাঁতে অশেষ জ্ঞান - শক্তি - বল - ঐশ্বর্য - বীর্য - তেজ আছে , কিন্তু যাঁতে প্রাকৃত গুণ নাই, বরং অপ্রাকৃত অশেষ গুণ আছে , তিনিই ভগবান। পূর্ণ ভগবান বলতে পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ নারায়ণকেই বোঝায়। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্বরূপ, ভক্তিমার্গের উপাস্য। ইনি চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ। ইনি পূর্ণ ভগবান কিন্তু স্বয়ং ভগবান নন ; কারণ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান বস্তু —

" অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।"

কিন্তু মার্গ বিশেষে তাঁর স্বরূপ শক্তির তিনটি রূপকে অর্থাৎ— ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের সাধনা করা হয়।

## ৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন এবং 'মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ' -- এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

২। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব সম্পর্কে যে রসাল আলোচনা আছে তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'শিক্ষাষ্টক'-এর যে কয়টি শ্লোকে কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাখ্যা-সহ সেগুলির উল্লেখ করুন।

৪। শিক্ষাষ্টক বলতে কী বোঝেন ? এর সাহায্যে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এর অন্তিম শ্লোকে বৈষ্ণবের কোনো শিক্ষণীয় বিষয় আছে কি না ব্যাখ্যা করুন।

৫। রায় রামানন্দ-সংবাদে চৈতন্যের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে সাধ্য - সাধনাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে - সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনামন্ত্রে তাঁকে 'রাধাভাব সুবলিতদ্যুতি তনু' এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলা হয়েছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। শিক্ষাষ্টক অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৮। মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী? সাধ্য-সাধনতত্ত্ব অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৯। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কী ভাবে শ্রীচৈতন্য জীবনে ও সাধনায় রূপায়িত হয়েছে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১০। রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আলোচনাটি এক চমৎকার নাটকীয় পরিবেশে স্থাপিত হয়েছে। —কীরূপে এই নাটকীয় পরিবেশ সংঘটিত হয়েছে, উভয়ের আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখান।

১১। শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের সাধ্য-সাধন সম্পর্কিত আলোচনায় রাধাপ্রেমকে কেন 'সাধ্যশিরোমণি' বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

১২। বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত বিচারকালে মহাপ্রভু জীব, জগৎ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা একে একে আলোচনা করুন।

১৩। বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বেদান্ত বিচারকালে মহাপ্রভু কীভাবে শংকরাচার্যের মায়াবাদকে একে একে খণ্ডন করে পরিণামবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন? আলোচনা করুন।

১৪। 'চৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যের অবতার স্বরূপের বিশ্লেষণ করুন।

১৫। স্বরূপ গোস্বামীর শ্লোক অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের অবতারতত্ত্ব যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করুন।

১৬। " ... মুর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ।।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি।।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১৭। "... সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।।
সূত্রের যে অর্থভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১৮। "বেদপুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ।।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান।।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১৯। "তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।।
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ।।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২০। "অপানি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ।।
অতত্রব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ।।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২১। "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২২। "পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।।"
—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন —

(ক) "ন ধনং ন জনং সুন্দরীং , কবিতাং ... বলে চৈতন্য মহাপ্রভু ধন - জনের সঙ্গে কবিতা ও কামনা করেননি (ন কাময়ে), অথচ তিনি "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি / রায়ের নাটকগীতি / কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ" নিরন্তর আস্বাদন করতেন, কেন?

(খ) "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা "ইত্যাদি শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

(গ) বাৎসল্য প্রেম সম্পর্কে মহাপ্রভু "এহোত্তম আগে কহো আর" বললেন কেন ? ---- আলোচনা করুন।

(ঘ) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে শ্রীচৈতন্য " এহো বাহ্য" বলেছেন কেন আলোচনা করুন।

(ঙ) চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তিনটি কারণ অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।

(চ) " কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পরে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে।।" ------ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(ছ) "গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।" -----বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসে এই উত্তরোত্তর স্বাধাধিক্য কীরূপে বাড়ে আলোচনা করুন।

(জ) অন্তঃকৃষ্ণ - বহির্গৌরত্ব --- আলোচনা করুন।

(ঝ) "এই তো পরম ফল পরম পুরুষার্থ" ----" পরম পুরুষার্থ " বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? তাকে 'পরমফল' 'পরম পুরষার্থ' বলার কারণ কী?

(ঞ) রায় রামানন্দের মুখে 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ' ইত্যাদি সংগীতটি শুনে মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে হাত দিয়ে আচ্ছাদন করেছিলেন কেন?

(ট) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে রাধা ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ কীরূপ, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঠ) শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবসাধনায় শ্রীরাধার বিরহচেতনার প্রভাব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(ড) " কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি , তাতে তিন প্রধান — " —
এই প্রধান তিনটি শক্তি কী কী ? এই তিনশক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঢ) " অরসজ্ঞ কাক দুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে ।।" — ব্যাখ্যা করুন।

২৪। টীকা লিখুন :

সাধারণী রতি ; বিবর্তবাদ ; তিনবাঞ্ছা ; সমঞ্জসা রতি ; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ; পরম পুরুষার্থ ; সখ্য-রস ; শান্তরস ; অহৈতুকী ভক্তি ; রাগানুগাভক্তি ; রাগাত্মিকা ভক্তি; জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধ তত্ত্ব ; সখী তত্ত্ব ; কাম ও প্রেম ; কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্; পঞ্চতত্ত্ব ; মানের মহিমা ; অভিধেয় তত্ত্ব ; গোপী প্রেম ; তটস্থা শক্তি ; মহাভাব ; স্বকীয়া- পরকীয়া তত্ত্ব; শঙ্করাচার্য; সার্বভৌম ভট্টাচার্য; অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব; মায়াবাদ; বিবর্ত্তবাদ; পরিণামবাদ; মুক্তি।

## ৬.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


১। চৈতন্যচরিতামৃত — সম্পাদনা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

২। শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন — শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

৩। চৈতন্যচরিতের উপাদান— বিমানবিহারী মজুমদার

৪। পদাবলী-পরিচয় — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে — শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৮। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস — দেবীদাস ভট্টাচার্য
৯। প্রাচীন কাব্য-সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন — ক্ষেত্রগুপ্ত
১০। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব — উমা রায়
১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — শ্রীমন্তকুমার জানা
১২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
১৩। বৈষ্ণব রস প্রকাশ — ক্ষুদিরাম দাস
১৪। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে, পদাবলী সাহিত্য তত্ত্ববিশ্লেষণ ও রসবিচার — কালিদাস রায়
১৫। Early History of Vaishnava Faith and Movement in Bengali - S.K.De
১৬। Philosophical Foundation of Bengal Vaishnavism – S.C. Chakraborty.

* * *

## বিভাগ- ৭
## শাক্ত পদাবলি
### শাক্ত পদাবলি : সাধারণ পরিচিতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ

**বিষয় বিন্যাস**


৭.০ ভূমিকা (Introduction)

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৭.২ শাক্ত পদাবলি : প্রসঙ্গ ও পরিচিতি

৭.৩ ভারতীয় শক্তি-সাধনার ধারায় শাক্ত পদাবলি

৭.৪ বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি ও শক্তি পদাবলি

৭.৫ আগমনি ও বিজয়ার লোক-ঐতিহ্য

৭.৬ আগমনি ও বিজয়া : পর্যায় পরিচিতি

৭.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৭.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৭.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৭.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৭.০ ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশের শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনা খুব বেশি পুরনো নয়। শশিভূষণ দাসগুপ্ত লিখেছেন— "বাংলাদেশকে আজ আমরা যেমন করিয়া শাক্তধর্মের দেশ বলিয়া জানি, হাজার বৎসর পূর্বেকার বাংলাদেশও কি এমনভাবে শাক্ত প্রধান দেশ ছিল এ কথা আমার বলিতে পারি না; তবে কতকগুলি শাক্ত-প্রবণতা নানা ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি।" (শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ: ৭)।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে শাক্তধর্মকে একটি গৌণ ধর্ম বলেই মনে হয়। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনাকে নির্ভর করে এই ধর্ম একটি বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাংলাদেশে এতদবিষয়ক যে কয়েকখানি পুরাণ বা উপপুরাণ লিখিত হয়েছে সেগুলিকে অবলম্বন করে বাংলাদেশে একটি বিশেষ মাতৃ পূজা বিধি গড়ে উঠতে দেখা যায়। বাংলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য রয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ- সংস্থান পরবর্তীতে মাতৃ-দেবীর সৃষ্টি এবং সাধনা করেছে। প্রধানত আর্যেতর সমাজগুলির মধ্যেই এই মাতৃতন্ত্রের বিস্তার দেখা যায়। তবে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধর্মমত কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় গড়ে তুলতে পারেনি। অন্যদিকে শক্তিপূজা বাংলাদেশে পঞ্চদশ- ষোড়শ শতকেও যে

ব্যাপক প্রসার লাভ করছিল তাও বলা যায় না। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের যে সকল দেবীর আবির্ভাব হয়েছে— তারাও কিন্তু সরাসরি বৈদিক দেব-দেবীর কৌলীন্য নিয়ে আবির্ভূত হননি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিপর্যস্ত অবস্থায় সমাজের নিচুলতার মানুষেরা মঙ্গলকাব্যের এইসব দেবীদের সৃষ্টি করেছেন। এই দেবীদেবই প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমাদের মঙ্গলকাব্যে এবং পরবর্তী সমাজ-জীবনে। পরবর্তীকালে নবাগতা এই দেবীদে র বৈদিক মাহাত্ম্যের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে।

শাক্তধর্ম বাঙালির মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে। কিন্তু এর অনেক পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশেই যে শাক্তধর্ম একটা বিশেষ ধর্মমত হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ফলে অষ্টাদশ শতকে সাধক রামপ্রসাদ যখন শাক্তধর্ম প্রচারের সচেতন প্রয়াস রূপে শ্যামা সংগীত বা শাক্ত-সাহিত্য রচনা করেন, তার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে উমা বিষয়ক আগমনি-বিজয়ার গান রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে মাতৃসাধনা বা মাতৃ-আরাধনার ইতিহাসে এই আগমনি-বিজয়ার গান বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শাস্ত্রে উমা, শ্যামা, কালিকা, দুর্গা, এদের সকলকেই জগৎ-মাতারই বিভিন্ন রূপা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিশিরস্নিগ্ধ শরৎ প্রভাতে যে মহামায়ার আগমন সূচিত হয় আগমনি গানের মধ্য দিয়ে, আমরা একে যদি বলি উমা-সংগীত— তাহলে বিসর্জনের পক্ষকাল পরে যে মহামায়া কালিকার আবাহন করা হয় তাকে বলা যায় শ্যামা-সংগীত । এই অভিন্নতার কারণেই উমা-সংগীতও শ্যামা-সংগীত সংকলনের অন্তর্ভুক্ত- হয়ে পড়ে।

আগমনি-বিজয়ার গান অন্তর্ভুক্ত হয় শ্যামা মায়ের সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের আধ্যাত্মিক চেতনার সংগীত সংকলনে। শাক্ত পদ-সংকলনগুলিতে উপাস্য শক্তি মূর্তি ভেদে উমা বিষয়ক ও শ্যামা বিষয়ক এই দুটি বিভাগে শাক্ত-পদগুলি সংকলিত হয়। সাধারণভাবে শ্রোতার কাছে আগমনি-বিজয়া গানের সার্বজনীন আবেদন থাকলেও এই গানগুলি প্রধানত গাওয়া হয় শারদীয় দুর্গা পূজার প্রাক্‌কালে। অন্যদিকে শ্যামা-সংগীতগুলি এইরকম কোনো সময় বিশেষে গীত হয় না। সারা বৎসর ধরেই এই গানগুলি গাওয়া হয়ে তাকে।

আগমনি ও বিজয়া আসলে দুটি পর্যায়। আগমনি পর্যায়ের গানগুলিতে গিরিজায়া মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে অনুরোধ করেন অনেকদিন মেয়েকে না দেখে তিনি উতলা হয়ে উঠেছেন— গিরিরাজ যেন অবিলম্বে কৈলাসে গিয়ে উমাকে নিয়ে আসেন। আর বিজয়া পর্বের গানগুলি কন্যার সঙ্গে মায়ের আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাতুর হয়ে উঠেছে। তিন দিনের জন্যে উমা বাপের বাড়িতে এসেছেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পার করে দশমীর দিন কৈলাসনাথ এসে পার্বতীকে নিয়ে যাবেন। এই নিদারুণ বিচ্ছেদের ভয়ে মেনকার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে।

আমরা এই বিভাগে আগমনি-বিজয়া পর্যায়ের গানগুলির কবি ও তাঁদের কবিত্ব। পদগুলির ভাষা ও ছন্দ, এদের লোক ঐতিহ্য প্রভৃতি আলোচনা করব।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

"শাক্ত পদাবলী মূলত শিবানী-কেন্দ্রিক, যিনি শিবজায়া। এই শিবানী একদিকে উমা বা গৌরী, অন্যদিকে দশধা শক্তির প্রতীক দশমহাবিদ্যা— কালী, তারা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা মাতঙ্গ আর কমলা। পুরাণে এই দশমহা বিদ্যায় দশ রকমের মূর্তি বর্ণিত হয়েছে। 'শ্যামা সঙ্গীত' শাক্ত পদাবলীর ওপর বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই শাক্তপদে ভক্তি মিশ্রিত বাৎসল্যরস প্রাধান্য পেয়েছে। তার সঙ্গে আছে শান্ত রসের পদ, কিন্তু মধুর রস এখানে অনুপস্থিত। মাতা আর সন্তানের মধ্যে মান-অভিমানের পালা আছে, কান্তাসম্মিত প্রেম সাধনা নেই।"

—শ্রী বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, বৈষ্ণব পদ সঞ্চয়ন

## ৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

দেবতা যে ছেলে মানুষরূপে জন্ম নেয়, সেই বাংলাদেশে সবার্থসাধিকা জগন্মাতা কালিকাও যে ঘরের মেয়ে রূপে জন্ম নেবেন তাতে আশ্চর্য কী। বাংলাদেশকে আজ আমরা শাক্ত ধর্মের দেশ বলে জানি। অথচ এদেশের পূর্ব ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে এই তথ্যকে সমর্থন করে না। তা না করুক। আমরা ঘরের মেয়ের মুখে জগৎ-মাতাকে দেখে অভ্যস্ত। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা উমা রূপে আমাদের ঘরে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় আগমনি গান। দশমীতে বিজয়ার গানে আদ্রমনে প্লাবিত হয় বাংলা। ধর্মীয় আবেগ মানবিক আবেগের সঙ্গে স্থান বদল করে। এই উমার আগমন ও শ্বশুরালয় গমন নিয়ে বাংলায় রচিত হয়েছে অজস্র গান। যা আগমনি-বিজয়া গান নামে পরিচিত। আগমনি বিজয়া গানগুলির লেখক একদিকে যেমন ভক্ত কবি রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের মতো খ্যাতনামা সাধক, অন্যদিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকা অনেক তন্ময় কবি-সাধক। যাঁদের নাম অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিশ্ব প্রসাধিনী কালিকাকে নিরে সাধক কবিরা রচনা করেছেন অনেক গান। যেগুলি শাক্তসাহিত্য বা শাক্ত-পদাবলি নামে আমাদের চোখে পরিচিত। আমাদের এই বিভাগে শাক্ত-সাহিত্যের সম্পূর্ণ বলয় আমরা স্পর্শ করব না। আগমনি-বিজয়া পর্যায়ের কবিদের কৃতিত্ব এবং তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এই বিভাগ থেকে আপনারা সমগ্র শাক্ত-সাহিত্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা করতে পারবেন। তাছাড়া আগমনি ও বিজয়ার লোক-ঐতিহ্য, আগমনি ও বিজয়ার পর্যায় পরিচিত এবং বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে শাক্ত পদাবলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

## ৭.২ শাক্ত পদাবলি : প্রসঙ্গ ও পরিচিতি

শক্তিপূজা ও মাতৃতান্ত্রিক সাধনা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি। কিন্তু সেই মাতৃতান্ত্রিক উপাসনার সঙ্গে আমাদের বর্তমান আলোচনার শাক্ত পদ রচনার কোনো প্রত্যেক্ষ যোগ নেই। একটু বিস্তারিত আলোচনা করলে এ-বিষয়ে আমরা

আলোকপাত করতে পারব। আমরা আগেও বলেছি যে মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা বাংলাদেশে অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। তবু খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে এই সাধনা বাংলাদেশে নতুন রূপ লাভ করে। শাক্তসাধনার এই নতুন রূপ বাংলার সমাজ সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও বাংলাদেশে এবং তৎ সংলগ্ন পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তান্ত্রিক প্রভাব অষ্টম শতকে এসে মহাযান বৌদ্ধধর্মের ওপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এরই প্রভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিকধর্মে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। এই কারণেই বৌদ্ধ "প্রজ্ঞা-উপায়"- এর পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধনা আর হিন্দু শিবশক্তির পরিকল্পনা এবং তদোচিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এই তন্ত্র সাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়ে সহজিয়া রূপ ধারণ করেছে। তারই ক্রমোপরিণতি বাংলাদেশের-বৈষ্ণব সহজিয়া এবং আউল-বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এই তান্ত্রিক ধারাটি ক্রমশ শক্তিপূজা বা শাক্ত নাম ধারণ করে। শক্তিপূজকদের এই তন্ত্র বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশ থেকে লাভ করেছিলেন — এরূপ মত প্রচলিত আছে। এই তান্ত্রিক আচার এই কারণে "চীনচার" নামেও প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের কাশ্মীর এবং অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এবং কামরূপ বেশির ভাগ তন্ত্রগুলির রচনা স্থান। ফলে তান্ত্রিক শক্তিসাধনায় বাংলাদেশ এক কামরূপের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গল থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল' পর্যন্ত সবই শাক্ত-সাহিত্য। তাহলে দেখা গেল বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের সীমান্ত পর্যন্ত শক্তিসাধনা এবং সেই সংক্রান্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও আমরা বলতে পারি এই শাক্ত উপাসনা পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে আমরা যাকে এখন শাক্ত পদাবলি নামে আখ্যাত করেছি, তাদের কোনো যোগসূত্র নেই। গীতিপদ রূপে শাক্ত কবিতা রচিত হয়েছিল ভক্ত কবি রামপ্রসাদের হাতেই। অরুণকুমার বসু লিখেছেন— "তারপর মাতৃসাধক অথা অন্যমার্গের ভক্তিবাদী অনেকের হাতেই কাব্যনুশীলনের অভ্যাসবশত এই শাক্তপদ গড়ে উঠেছে, যার প্রচলিত নামান্তর শ্যামাসংগীত। আগমনি-বিজয়া জাতীয় পদের পাশেই এই শ্রেণির পদের আশ্রয় হয়েছে, দুটি কারণে। প্রথম কারণ, অনেক সময় একই কবি উভয় জাতীয় পদ লিখেছেন; দ্বিতীয় কারণ, ভক্তের-দৃষ্টিতে উমা ও শ্যামার অভেদত্ব সম্পর্কে একটি নিশ্চিত বিশ্বাস আছে। কবি সংগীতের যুগে অবশ্য আগমনি- বিজয়া শব্দ এই গীতি বিশেষকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। অন্য শ্যামাবিষয়ক পদের নাম ছিল মালসী।"

রামপ্রসাদ স্বয়ং তন্ত্র সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত শাক্ত পদগুলিতে তান্ত্রিক উপাসনার গুহ্য সূত্র দেখা যায় না। বরং শাস্ত্রসম্মত কর্মকাণ্ড পরিহার করে সাধারণ মানুষের জীবেনের সহজ মাতৃভাবনা ও ভক্তিকে তার পদগুলিতে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস শাক্ত ছিলেন বলে খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর রচিত কোনো শক্তি বিষয়ক গান দেখা যায় না। বিদ্যাপতির লেখা শিবশক্তি বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে। কিন্তু সংখ্যায় এগুলি অতীব অল্প এবং কবিত্বেও নিকৃষ্ট। বাংলায় রামপ্রসাদ সেনই প্রথম শক্তিরূপা জগৎ জননীকে আপন মাতৃরূপে আরাধনা করে অপূর্ব পদ রচনা করলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্তপদাবলী' গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন — "এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শ্যামা মাকে ডাকিবার ভাব, ভাষা ও সুরের জন্য রামপ্রসাদের নিকট যতটা ঋণী, তত আর কাহারও নিকট নহে। 'প্রসাদী সুর' রামপ্রসাদের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি । মাতৃভাবাশক্তি— প্রকাশের এমন মন-মাতানো শক্তির কোন শক্তি আছে কিনা, জানি না।" এই লৌকিক মানবতাবাদী হিসাবেই বাংলাদেশে রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তা আজও সমান ভাবে চোখে পড়ে।

শাক্তপদ সাহিত্যে আমরা তিনটি যুগ বিভাগ লক্ষ করি। এই যুগ বিভাগের প্রথম পর্বে রয়েছেন রামপ্রসাদ সেন। (১৭২০-১৭৮১) শ্যামা নামের জোয়ারে তিনি বাঙালির মাতৃভাবকে জাগিয়ে তুললেন। "আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়," "গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না, " "আজ শুভনিশি গোহাইল তোমার," "ওহে প্রাননাথ গিরিবর হে ভয়ে তুন কাঁপিছে আমার।"— এ-সমস্ত আগমনি-বিজয়ার পদে যেমন বাৎসল্য রসের প্রকাশ, তাতে ভক্তিও কিন্তু সমানভাবে মিলে রয়েছে। তাছাড়া "মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে,"" বসন পর, বসন পর, মাগো," "কেবল আশার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হল", "আমি অই খেদে খেদ করি" "মা আমার ঘুরাবি কত," " ম'লেম ভূতের বেগার খেটে," ইত্যাদি পদে যে অপূর্ব কবিত্ব এবং মাতৃ ভাবনার মিশ্রণ দেখা যায় তা বাংলাদেশের পদ-সাহিত্যে আগে পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় পর্ব-কালতে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ধরা যায়। এই পর্বে প্রধান কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। কমলাকান্তের জন্ম হয় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বর্ধমান রাজদরবারের সভাকবি ছিলেন। রামপ্রসাদের সময়ে দেশের যে অস্থিরতা যা থেকে মুক্তি পাবায় জন্যে সাধক কবি মাতৃচরণে স্থান নিতে চান সেই অস্থিরতা কমলাকান্তের যুগে এসে অনেকটা সুস্থির হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক সুনিশ্চিৎ পটভূমিকায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের পদগুলি রচিত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে কমলাকান্তের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও রাজাশ্রয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কমলাকান্ত দেহত্যাগ করেন। কমলাকান্ত ছাড়া এই পর্বে যাঁরা শাক্ত পদ রচনা করেছেন তাদের বেশির ভাগই ভূ-স্বামী-জমিদার, কেউ দেওয়ান কেউ বা নায়েব। আর কিছু মানুষ কবিওয়ালা বা যাত্রাকার। এঁদের মধ্যে কালীমির্জা, দেওয়ান নন্দকুমার, রায় মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, রাম বসু, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, এন্টনি ফিরিঙ্গি, কুমার নরচন্দ্র, গদাধর মুখোপাধ্যায় হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক, মহারাজ শিবচন্দ্র রায়, কুমার শম্ভুচন্দ্র রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় , নীলমনি পাটনি, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নীলু ঠাকুর, ঠাকুরদাস দত্ত, দাশরথি রায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নবাই ময়রা, আশুতোষ দেব, রসিকচন্দ্র রায় প্রমুখ।

শাক্ত পদ সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে আমরা এতেবাবেই আধুনিক যুগে এসে পড়ি। আনুমানিক ১৮৫০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত এ-পর্বের বিস্তার। এই সময়কালের মধ্যে যারা শাক্ত পদ রচনা করেছেন, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক থেকে বা উপাসনার দিক থেকে এদের অনেকেই শাক্ত ছিলেন না। এরা অনেকেই ছিলেন কবি, গীতিকার, নাট্যকার যাত্রাকার বা পাঁচালিকার। কিন্তু তাঁদের লেখা পদের আবেদন, উৎকর্ষ এবং রীতিগত

আদর্শের দিক বিচার করে এই পদগুলি শাক্ত পদাবলিতে সংকলিত হয়েছে। আধুনিক পর্বের এই কবিদের তালিকা অতি বৃহৎ। আমরা প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ করব — অক্ষয়চন্দ্র সরকার, অমৃতলাল বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নজরুল ইছলাম, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ চৌধুরি, ত্রৈলোক্যনাথ কবি ভূষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, মনমোহন বসু, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, রূপচাঁদ পক্ষী, মধুসূদন দত্ত, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ। (নামগুলি আরো বিস্তারিত জানবার জন্য অমেরন্দ্রনাথ রায়ের 'শাক্ত পদাবলী' এবং অরুণকুমার বসু সম্পাদিত 'শাক্ত পদাবলী' বই দুটি দেখা যেতে পারে।) শাক্ত পদ সাহিত্যের তৃতীয় পর্বের অন্যতম প্রধান কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর লেখা শাক্ত পদগুলির বিষয়ে ও আকুতিতে রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের হাতেও শাক্তপদ রচিত হয়েছে। বাল্মীকি প্রতিভা নাটকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অপূর্ব শাক্তপদ রচনা করেছন। তার মধ্যে একটি—

"শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুই, না বুঝে মা বলেছি মা !
এতদিন কী ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা !
কালো দেখে ভুলিলে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা।
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা।।"

## ৭.৩ ভারতীয় শক্তি-সাধনার ধারায় শাক্ত পদাবলি

দেবতার চিন্ময় রূপদান করতে গিয়ে আমরা অবশেষে আশ্রয় করি এই ধরার ধুলির মানুষের রূপ-গুণকেই। আমাদের চোখের সামনে দেখা মানুষের রূপ-গুণকে যতটুকু পারা যায় বাড়িয়ে নিয়ে আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে দেবতার সৃষ্টি করেছি। কারণ — "আর পাব কোথা। দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।" যদিও আমাদের বাংলাদেশে দেবতা মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই সত্য বাঙালি প্রত্যক্ষ করেছে। অন্যদিকে, শাক্ত কবিরাও কৈলাস-বাসিনী উমাকে বাংলার মাটির কুটিরের আঙিনায় নামিয়ে এনে আমাদের মর্ত্যের উমাকে নতুন মহিমা দান করেছেন।

দেব-দেবীগণের মধ্যে তিনটি যুগল রূপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁরা হচ্ছেন হর-গৌরী বা উমা-মহেশ্বর, সীতা-রাম এবং রাধা-কৃষ্ণ। কিন্তু দেবী বলতে আমরা আজ যা বুঝি তা রাধা বা সীতার মধ্যে ততখানি পাওয়া যায় না, যতখানি পাওয়া যায় দেবী পার্বতীর মধ্যে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে সর্বরূপে এই উমাকে আমরা পেয়েছি। তাকে দেখা গেছে ভিখারির ঘরে ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা অনশন ক্লিষ্টা ভিখারিনি রূপে, আবার দেখা গেছে অন্নপূর্ণার মহা ঐশ্বর্যে। আবার তাকে পেয়েছি ভয়ঙ্করী অসুর নাশিনীরূপে, তাকে দেখেছি নটরাজের লাস্যময়ী নৃত্য সঙ্গিনী রূপে, কখনো বা জটাজুটধারিণী যোগেশ্বরী রূপে। কুমারী রূপে তিনি, সর্বকল্যাণময়ী, মাতৃরূপে

তিনি সর্বমহিমাময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ দেবী পার্বতীকে সমাজ জীবনের প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে যেমন করে মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছে, তেমন তার আর কোনো দেবীকে পায়নি।

"কুমার সম্ভবে" কবি কালিদাস দেবী পার্বতীর যে রূপের বর্ণনা করেছেন এবং যে লীলার বর্ণনা করেছেন তা-ই পল্লবিত হয়েছে 'সদূক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিত রত্নকোষ' ইত্যাদি গ্রন্থে। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত দেবী পার্বতীকে কেন্দ্র করে কোনো শক্তি বা তান্ত্রিক সাধনা গড়ে ওঠেনি। যদিও সাহিত্য এবং তান্ত্রিক পুথিগুলি আলাদা। তাছাড়া তান্ত্রিক সাধনার ধারা ভারবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এই সাধন ধারার সঙ্গে বিভিন্ন কালে হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত হয়ে একে হিন্দু তন্ত্রের রূপ দান করেছে। পরবর্তীকালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্তে হয়ে এগুলি বৌদ্ধতন্ত্রের রূপ লাভ করে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজ স্তরের মানসিক প্রবণতায় বিভিন্ন ভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় দেব-দেবীগণ প্রচার ও প্রসিদ্ধির কারণে সাধারণীকৃত হয়ে তান্ত্রিক দেব-দেবীর রূপ লাভ করেছে। এই কারণে স্বাভাবিকভাবে যুগ যুগ প্রবাহিত হিন্দু শিব-পার্বতী ধারণা এবং বৌদ্ধ সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী মিলে মিলে এক হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের তন্ত্র-সাধনা মূলত একটি গুহ্য সাধন পদ্ধতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সাধন পদ্ধতিগুলি পরবর্তীকালে লোকায়িত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিলে হিন্দুতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। ফলে বৌদ্ধ "প্রজ্ঞা উপায়" আর হিন্দু শিব শক্তির সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। এই তন্ত্র-সাধনারই একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ সহাজিয়া রূপ ধারণ করেছে। চর্যাপদ, বাউল গান, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি লৌকিক ধারার গানগুলি সেই তান্ত্রিক ধারারই উত্তরাধিকার। বাংলার শাক্ত পদগুলি আদর্শগতভাবে এদের থেকে খুব দূরে নয়। বাংলাদেশে প্রচলিত দেবীপূজা বা মাতৃপূজার যে প্রচলিত বিচিত্র রূপ রয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের বর্তমানকালের মাতৃদেবীর মধ্যে বহু যুগে বহু-ধারা এসে মিলে গেছে। কাশ্মীর, নেপাল, ভূটান,তিব্বত, বাংলা এবং কামরূপ— হিমালয়ের পাদদেশে স্থিত এই অঞ্চলগুলিতে তন্ত্রসাধনার ইতিহাস আমরা পাই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে শক্তি বিষয়ক তন্ত্রগুলি বঙ্গ এবং কামরূপে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। আমাদের শাক্ত সাহিত্যে উপরোক্ত সকল ধারাগুলির প্রভাব ও পরিণতি লক্ষ করা যায়। একটি পদ উদ্ধৃত করি—

"হৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ওমা।।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা।।
কাম-আদি মোহ যায় হেরিলে অমনি ও মা ।।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা।।"

—রামপ্রসাদ সেন।

## ৭.৪ বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি ও শক্তি পদাবলি

শাক্ত পদাবলি পদ বন্ধটি বৈষ্ণব পদাবলির সাদৃশ্যে তৈরি করা হয়েছে। শাক্ত-সঙ্গীতগুলিকে প্রথম পদাবলি নামে সংকলন করেন সম্ভবত শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে পর্যন্ত এগুলিকে শ্যামাসঙ্গীত বা মালসী গান রূপেই আখ্যাত করা হত।

পদাবলি শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে বৈষ্ণব পদাবলির কথা ভেসে ওঠে। এ বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতির সঙ্গে কয়েক শ বৎসর ধরে মিশে আছে। শাক্ত পদাবলির সে ঐতিহ্য নেই। আঠারো শতকের মাঝামাঝি রামপ্রসাদের হাতে শাক্তসংগীতগুলির উদ্ভব ও বিকাশ। রামপ্রসাদ তখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একজন হয়ে ওঠেননি। তাঁর একক প্রয়াস শাক্ত-সংগীতগুলিকে ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছে। পরবর্তীকালে তাঁর অনুপ্রেরণা ও রীতি অনুসরণ করে, ধর্মীয় প্রেরণায় অথবা সাধারণ কাব্য প্রেরণায় সমজাতীয় অনেকগুলি পদ রচিত হয়েছে। বেশির ভাগ সময়েই এই কবিরা এককভাবে তাঁদের গানগুলি রচনা করেছেন। কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর তত্ত্ব স্বরূপ এই গানগুলি রচিত হয়নি। এই গানগুলিকে একত্র সংকলন করে শাক্ত পদাবলি নামে প্রকাশ করা হয়। এর ফলেই পরবর্তীকালে শাক্ত-সংগীতগুলিকে শাক্ত পদাবলি নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যথায় এই শাক্ত পদাবলিগুলির পেছনে কোনো ঐতিহ্য কোনো পূর্বসত্ত্ব বা ধারাবাহিকতার তাগিদ ছিল না।

বৈষ্ণব পদাবলি ও শাক্ত পদাবলিগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য খুব সুন্দবভাবে তুলে ধরেছেন অরুণকুমার বসু। তিনি তাঁর 'শাক্ত পদাবলি' নামক গ্রন্থে বলেন— "প্রকৃতপক্ষে পদাবলি শব্দটি শাক্ত কবিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শিতিলভাবে ব্যবহৃত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম সংগীত, সাধন সংগীত বা অনুশীলন- সংগীত হল তাঁদের কীর্তন, অর্থাৎ বিভিন্ন বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদের বিপুল ঐশ্বর্য। তাকেই তাঁরা বলেন পদাবলি। কোনো নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবই একজন মাত্র কবির গুটি কতক পদের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকেন না। বৈষ্ণব পদের ক্ষেত্রে রয়েছেন তিনজনের ভূমিকা— একজন বৈষ্ণব কবি বা পদকর্তা অন্যজন কীর্তনীয়া তথা পদটির গায়ক, অন্যজন ভক্ত বৈষ্ণব যিনি ভক্তিভরে পদটি শ্রবণ করেন। এই কীর্তনীয়াদের হাতেই পদাবলি শব্দটি গড়ে উঠেছে। পদামৃত সমুদ্র, পদাবলি চূর্ণ পদরত্নাবলি, পদরসসার ইত্যাদি নামের পুরাতন ব্যবহার এই পদাবলি জাতীয় শব্দের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ।

এইভাবে ভক্তবৈষ্ণবদের কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব পদাবলির একটা রীতি দীর্ঘকাল ধরে কবি-গায়ক-কীর্তনজ্ঞের দ্বারা গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞরা সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি বা পদ্ধতি স্থির করে দিয়েছেন। তারই আদর্শে বাল্যলীলা, গৌষ্ঠ, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর ইত্যাদি শব্দে পদের পর্যায় নির্দেশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে প্রতি পর্যায়ের উপযুক্ত গৌরিচন্দ্রিকা।"

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা শহরে কবিওয়ালাদের গান খুব জনপ্রিয় ছিল। এই কবিগান সারারাত ধরেই পরিবেশিত হত। এই কবিগানগুলিতে আগমনি গান পরিবেশিত হত। এছাড়া 'মালসী' নামে অন্যান্য শ্যামাসংগীতও পরিবেশিত হত। সেই 'মালসী' জাতীয় গানে কোনোরকম বিষয়গত পর্যায়ভেদ ছিল না। পরবর্তীকালে কোনো কোনো সংকলনের সংকলকেরা তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামত 'ভক্তের আকূতি' 'জগজ্জননীর রূপ' 'মনোদীক্ষা' 'মা কীও কেমন' প্রভৃতি শিরোনাম নির্দেশ করেছেন। এর পেছনে কোনো তাত্ত্বিক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব পদাবলির অনুকরণেই এই তথাকথিত পর্যায় নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্ভবকালের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলিও শাক্ত পদাবলি উভয়ের মধ্যে বিপুল পার্থক্য বর্তমান। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে পদাবলি শব্দের উত্তরাধিকার সম্ভবত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' থেকে। সেই পদাবলি কালক্রমে বিদ্যপতি, চণ্ডীদাসের হাতে তার জয়যাত্রার সূচনা করেছে। ষোড়শ শতাব্দীকে বৈষ্ণব পদাবলির স্বর্ণযুগ বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে, তার অমৃতময় জীবনচরিত এবং তার প্রচারিত ধর্মের দর্শন গলিত সাহিত্যিক রূপ ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যিক উৎকর্ষে ভরিয়ে দিয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলির এই প্রাণশক্তি অব্যাহত ছিল।

অন্যদিকে শাক্ত পদ সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামপ্রসাদেকে আশ্রয় করে পরিচিত এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। বৈষ্ণব পদাবলির গীত-মাধুর্য তখনও সমাজে জনপ্রিয়তা হারায়নি। কিন্তু শক্তি উপাসনার এই নতুন ধারা এবং মাতৃভাবনাময় রামপ্রসাদের আন্তরিক গানগুলি মাতৃ ভক্ত বাঙালির কাছে একটি নতুন আকর্ষণ রূপে পরিগণিত হয়। উনিশ শতকে শাক্ত পদাবলি রচনা সমানভাবে চলতে থাকে। এমনকি বিশ শতকের প্রথমার্ধেও ধর্মনিরপেক্ষ গীতি কবিরাও শাক্তপদ রচনা করেন এবং সার্থকতা লাভ করেন।

বৈষ্ণব পদাবলির কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। বৈষ্ণব পদাবলির পেছনে দর্শন ও অলংকার শাস্ত্রের প্রেরণা হিসাবে ছিল শ্রীমদ্ভাগবত, গীতগোবিন্দম্, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র ও রসশাস্ত্র। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনও তাঁদের কাছে অন্যতম আদর্শ ছিল। সেই তুলনায় শাক্ত করিবা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তারা মাটির কাছাকাছি থেকে জীবনের দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দুঃখবসানের কামনায় ত্রাণকর্তীর বোধন মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। এঁদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনেরই তন্ত্রোক্ত মাতৃ-উপাসনাবিধি করায়ত্ত ছিল। যেহেতুে শাক্ত পদাবলির কবিরা মাটির কাছাকাছি বাস্তব-জীবন থেকে উঠে এসেছেন, সেহেতু এঁদের লেখা পদাবলির সংসার চিত্র একান্তই চোখে-দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতার সমাজ। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন — "আমাদের পানা পুকুরের ঘাটেয় ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

কাব্যেমূল্যের দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলির তুলনায় শাক্ত পদাবলিগুলি সমান গভীরতা যুক্ত না হলেও নিতান্ত অবহেলার সামগ্রীও নয়। বৈষ্ণব পদাবলির গভীরতা অতলস্পর্শী হয়ে ওঠে এর মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে। তেমনি শাক্ত পদাবলির আগমনী-বিজয়া পর্বের গানগুলি বাঙালি কদরের অভিমানিনী কন্যায় জন্য গভীর বেদনাবোধেরই মহৎ উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

শিল্পরূপের দিক থেকে বৈষ্ণব কাব্য ঐতিহ্যগত ভাবে বর্ণময়, এর ভাষা লাবণ্যময়, ছন্দ শ্রুতিমধুর। এর সৃষ্টি অলংকার শাস্ত্র সম্মত। অন্যদিকে শাক্ত পদগুলি ছন্দ-অলংকারের দিক থেকে শিথিল ও আকস্মিক। রামপ্রসাদ বা কমলাকান্ত ছাড়া অন্যান্য কবিরাও যথেষ্ট প্রতিভাশালী নন।

বৈষ্ণব পদাবলির ঐতিহ্যের দ্বারাই শাক্ত পদাবলি প্রভাবিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন রসভেদে শাক্ত পদাবলিরও অনুরূপ পর্যায় ও রসভেদ ঘটেছে। কিন্তু সবসময় তা যে সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। তবে শাক্ত পদগুলো বেশিরভাগই তাদের কবিদের স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টি পরবর্তীকালে অবশ্য শ্যাম-শ্যামার সমন্বয়ের একটি তত্ত্বও গড়ে উঠেছিল।

## ৭.৫ আগমনি ও বিজয়ার লোক- ঐতিহ্য

শ্যামা সঙ্গীত বা শাক্ত-বিষয়ক গানগুলি রামপ্রসাদের হাতেই প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু আগমনি-বিজয়া গানগুলি সম্পর্কে এই কথা বলা যায় না, কারণ আগমনি-বিজয়ার গানগুলি রামপ্রসাদের অনেক আগে থেকেই বাংলার লোক-ঐতিহ্যে প্রচলিত ছিল। এই বিষয়টির ওপর প্রথম আলোকপাত করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর বয়সে জমিদারি সংক্রান্ত কাজে শিলাইদহে বাস করার সময় রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচিত্র সম্পদের সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় তিনি লক্ষ করেন যে হর-পার্বতীর কাহিনি বাংলার লোক-সংস্কৃতির একাধিক শাখাকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে আছে। আগমনি-বিজয়া গানগুলি তারই অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার লোক সাহিত্যে অনেক পূর্বে থেকেই যে আগমনি-বিজয়া গানগুলি গীত হত, তা রবীন্দ্রনাথও লক্ষ করেছেন। আগমনি পর্যায়ের একটি পদে পাই ---

"শরৎকালে রাণী বলে বিনয় বচন
আর শুনেছো গিরিরাজ নিশার স্বপন?"

এই পদটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন— "এই স্বপ্ন, হইতে কথা আরম্ভ। সমস্ত আগমনি গানের এই ভূমিকা। প্রতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশির সিক্ত এবং রৌদ্রর রঙ কাঁচা সোনার মতো হইয়া আসে, তখন গিরিরানী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন। আর বলেন — 'আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন?' এ-স্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিতাবিভাস এবং রামকেলি রাগিনীকে শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই তিনি নূতন করিয়া শোনেন। ইতিবৃত্তের কোন বৎসরে জানি না, হর-গৌরীর বিবাহের পরে প্রথম যে শরতে মেনকারানি স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে, যাহাকে পরের হাত দিয়াছি আমার সেই আপনার ধন কোথায়!" —

"বৎসর গত হয়েছে কত করছে শিরের ঘর,

যাও গিরিরাজ আনতে গৌরী কেলাস শিখর।"

গৃহিণীর এই অনুরোধ শুনে, জড়তা ভেঙে, অচলের সচল হতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। গৃহিণীর অনুরোধ দিনে দিনে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে পরিণত হয়। আবশেষে গিরিরাজ হিমালয় কন্যাকে আনত কৈলাস গমন করেন। সেখানে কন্যা দর্শন, পিতা ও কন্যার কথোপকথন হয়। এর পর কন্যা এবং দৌহিত্র-গণ সহ হিমালয় নিজগৃহে ফিরে আসেন। তিন দিন ধরে হিমালয় গৃহে আনন্দ উৎসক চলতে থাকে। অবশেষে সেই কঠিন বিজয়ার দিনটি এসে পড়ে। পার্বতীকে নিয়ে যাবার জন্যে মহাদেব এসে উঠোনে দাঁড়ান। মোটামুটি এই হল আগমনি-বিজয়া গানের বিষয়বস্তু।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ- ১**

"যদিও 'দক্ষিণাচারতন্ত্ররাগে' গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর দেশীয়লোক শুদ্ধাচারী শক্তি উপাসক বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই, এ ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রবল। এখানে যেমন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নানবিধ শক্তি-মূর্তির প্রতিমা নির্মাণ করিয়া অর্চনা করা হয় এবং বিশেষতঃ আশ্বিন মাসে যেরূপ উৎসাহ ও সমারোহ পূর্বক দুর্গোৎসবের ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় না। ফলতঃ বঙ্গভূমি বামচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় প্রকার শাক্ত সম্প্রদায়েরই প্রধান স্থান।"

(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়— অক্ষয়কুমার দত্ত — (১ম ও ২য়) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পাঠভবন, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, প: ৩১১)

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ- ২**

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন— "বাঙলা দেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিত মহলে বা উচ্চকোটি মহলে যতই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অসুরনাশিনী দেবীর পূজা মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অসুর নাশিনী মূর্তিতে দেখেন— কিন্তু ঐ পর্যন্তই; তাহার পরে তাঁহারা স্থির নিশ্চিতরূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়— উমা মায়ের স্বামীগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্র কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিন দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ— তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া —স্বামীর, গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে আলম্বন করিয়াই ত আমাদের এত আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের উদ্ভব।"

## ৭.৬ আগমনি ও বিজয় : পর্যায় পরিচিত

এবার আমরা আগমনি ও বিজয়ার পর্যায় পরিচিত আলোচনায় অগ্রসর হব।

**আগমনি**:

আগমনি বিজয়া পর্যায়ের পদগুলিতে অসুর বিনাশিনী দশ-ভূজা দশপ্রহরণধারিণী দেবি দুর্গা তার ঐশ্বর্য মূর্ত্তি সংবরণ করে বাঙালির মাটির উঠোনে কন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। জগৎ-জননীকে দূর থেকে ভয়ে ভক্তিতে প্রণাম করার বদলে ঘরের কন্যা সন্তানটিকে গিরিরানি বুকে জড়িয়ে স্নেহে ভরিয়ে দিয়েছেন। নিজের আঙিনায় খেলা করে বেড়ানো শিশু কন্যাটি যখন ডাগর-ডোগর হয়ে ওঠে তখন অশ্রুজলে প্লাবিত হয়ে বাবা-মা তাকে স্বামীর ঘর করতে পাঠায়। সারাটি বছর পিতা মাতা কন্যার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কন্যাকে কাছে পাবার জন্যে অশ্রু প্লাবিত হয়। আশ্বিন মাসে পূজার সময় সেই কন্যাকে কাছে পাবার জন্য মা অস্থির হয়ে ওঠেন। সেই কন্যাটিকে কাছে পাবার জন্য পিতা-মাতার আকূতির অন্ত থাকে না। বাংলার ঘরে ঘরে স্বামীগৃহে পাঠানো কন্যার প্রতি পিতা-মাতার এই অশ্রুজলকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে আগমনি-বিজয়ার গানগুলি। এতখানি সজীব এতখানি করুণাঘন, এত অফুরন্ত মমতায় আর্দ্র।

শরতের কোমল রোদ্দুর যখন বাঙালির মাটির ঘরের আঙিনা ছুঁয়ে যায়, শিউলি ফুল কার চরণে অঞ্জলি হবার জন্য ঝরে ঝরে পড়ে, আর তারই সুগন্ধে যখন শারদোৎসব আসন্ন মনে হয়— তখন গিরিরানি গিরিবরকে বলেন, "মাকে নিয়ে এসো। আর শোন এবার আমর উমা এলে ওকে আর কৈলাসে পাঠাব না।" রামপ্রসাদ সেন লিখেছেন—

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়--
এবার মায়ে-কিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।।"

মা মেনকা নানাভাবে উমার কথা স্মরণ করে ব্যাকুল হয়েছেন। নানাপ্রকার অজুহাত তুলে তিনি হিমালয়কে তাঁর প্রাণের উমাকে নিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেছেন। ভোররাতে স্বপ্ন দেখে মেনকা জেগে উঠেছেন। আকস্মিক স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠে মেনকা কন্যার জন্য বিহ্বল হয়েছেন। কমলাকান্ত এঁকেছেন সে আকুলতার ছবি —

"আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে, ..."

এত কাতর আবেদন শুনেও হিমালয়ের ঘুম ভাঙেনি। শয্যা ছেড়ে তিনি উঠেননি। ফলে মেনকাকে আরও বিনতি করতে হয়। তিনি গিরিরাজকে জানিয়ে দেন ভোলা অতি

অল্পেই সন্তুষ্ট হন। ফলে তাঁকে বিল্বপত্রে পূজা করলেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে উমাকে হিমালয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন। রাম বসু গাইছেন —

"গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন তার গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা তারাধন।"

বাবা মা স্বামীগৃহগতা কন্যার খোঁজ খবর নেন না, পিতৃগৃহে আনবার জন্য লোক পাঠান না। — এ-সমস্ত কারণে সদ্য বিবাহিতা কন্যা পিতা মাতার প্রতি অভিমানী হয়ে ওঠে, সে খবর যখন মা-র কানে ত্রসে পৌঁছয় তখন কেমন করে সে নিজেকে প্রবোধ দেবে। কমলাকান্ত লিখেছেন —

"ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।
মনোদুঃখে নারদে কত না কয়েছে —
দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বুলি নিতান্ত পাসরেছে।।"

মেনকার মুখে এই কথা শুনে এরপরে হিমালয় কৈলাসে গিয়ে উমাকে নিজগৃহে নিয়ে আসরার জন্যে যাত্রা করেছেন। কমলাকান্ত সুন্দরভাবে হিমালয়ের সেই কন্যা সকাশে যাত্রার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হরিষে-বিষাদে মেশানো ছবিটি অঙ্কন করেছেন এইভাবে—

"গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে।।
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রানিরে।।"

অবশেষে পিতা জামাতা-গৃহে পৌঁছেছেন। গৌরী মাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলছেন। তার বিহনে গিরিপুর যে অন্ধকার সে বিবরণটি কালীনাথ রায়ের পদে সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে—

"চল মা, চল মা গৌরি, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হলে জানিতে উমা, মমতা পিতা-মাতার।।
তব মুখামৃত বিনে, আছে রানি ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।"

কমলাকান্তের একটি পদে দেখি, উমা স্বামীর কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন--

"ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে,
হয় নয় প্রকাশ বদনে।।
জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে
আর তব দরশনে।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিবের সম্মতিটিও বড় মনোহর—

"জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার?
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর!"

এরপর কন্যা এবং দৌহিত্রদের সঙ্গে নিয়ে হিমালয় গিরিপুরে পৌঁছলেন। মেনকার হাতে তাঁর চোখের মণিকে সঁপে দিলেন। কমলাকান্তের ভাষায় —

"গিরিরানি, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হবের জীবন- ধন।"

অনেক সময় কন্যার আগমনের সংবাদ মেনকা শোনেন প্রতিবেশিনীর মুখে। কমলাকান্তের একটি পদে দেখি—

"এল গিরি নন্দিনী লয়ে সুমঙ্গলী ধ্বনি ঐ শুনো ওগো রানি
চল, বরণ করিয়ে উমা আনি, মেয়ে কী জরা পাষাণী রমনি গো।
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে ধাইল যেন পাগলিনী
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণি।।"

কিন্তু দশভূজা দুর্গাকে দেখে মেনকা প্রথমে চিনতে পারেননি। এ তো তাঁর উমা নয়। ব্রজমোহন রায় লিখেছেন —

"কে রণ-রঙ্গিনী!
কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে— এ নয় আমার প্রাণকুমারী।"

**বিজয়া** :

অবশেষে মা মেয়ের মিলন হয়।। এক বৎসর পরে দুজনরেই সাক্ষাৎ। মেয়ের বেদন একমাত্র মা-ই বুঝতে পারেন। সংসারের হাজার সমস্যা, হাজার বাধা ঠেলে মেয়ে যখন মাতৃভবনে আসেন তখন মা-মেয়ে উভয়েই যেন নব-জীবন পায়। কিন্তু এই সুখ

বেশি দিন স্থায়ী হয় না। সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পার করে, দীপালোকে উজ্জ্বল উৎসব মুখরিত গৃহ ম্লান করে দিয়ে, দশমীর দিন উমাকে চলে যেতে হয়। মা মেনকার বুকফাটা কান্না শোনা যায় মাইকেল মধুসূদনের এই পদটিতে —

"যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!"

কিন্তু নবমী নিশি অবশেষে অবসান হলই। কমলাকান্তের পদে মেনকার সে আর্তনাদ শোনা যায়—

"কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।।"

বিজয়া শীর্ষক এই পদগুলিতে মা মেনকা বাংলার মাটির ঘরের অভাগিনী মা-য়ে পরিণত হয়েছেন। কন্যা বিদায় লগ্নের সে আর্তি মেনকার মুখে শোনা যায় যে ভাষা আমাদের অতি পরিচিত। যে ভাষা গ্রামে গ্রামে প্রতিটি গৃহ প্রাঙ্গনে স্বামী গৃহযাত্রী কন্যার বিদায় লগ্নে প্রতিটি মায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। আর বাংলার বাতাসকে ভারী করে তোলে। কমলাকান্ত গাইছেন —

"ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো?
রতন ভবন মোর আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন।
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা !
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।।"

## ৭.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা শাক্ত পদাবলি। আলোচ্য বিভাগে আমরা প্রথমে শাক্ত পদাবলির সাধারণ পরিচয় তুলে ধরেছি। এ-প্রসঙ্গে এসেছে ভারতবর্ষের শক্তিপূজা ও মাতৃতান্ত্রিক সাধনার সংক্ষিপ্ত পশ্চাৎপট। শাক্ত পদাবলির বিশেষ শাখা আগমনি ও বিজয়ারও সাধারণ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। শাক্ত পদকর্তাদের নাম ও সাধারণ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর ভারতীয় শক্তি সাধনার ধারায় শাক্ত পদাবলির স্থান আলোচিত হয়েছে। এছাড়া আগমনি ও বিজয়ার পদে লোক-ঐতিহ্যের উপাদান, আগমনি ও বিজয়ার পর্যায় পরিচিত এবং বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে শাক্ত পদাবলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

## ৭.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ৭.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ৭.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

## বিভাগ- ৮

# শাক্ত পদাবলি

## শাক্ত পদাবলি : কবি-কৃতিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

**বিষয় বিন্যাস**


৮.০ ভূমিকা (Introduction)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ আগমনি ও বিজয়া পদের কবি ও কবি-কৃতিত্ব

৮.৩ বাংলা সাহিত্যে শক্তি সাহিত্যের উত্তরাধিকার

৮.৪ আগমনি ও বিজয়া পদের ছন্দ ও ভাষা

৮.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৮.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৮.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৮.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৮.০ ভূমিকা (Introduction)

বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শক্তিশালী শাখা হল শাক্ত পদাবলি। মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিককালের অনেক কবি শাক্তপদ রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা শাক্ত পদাবলির সাধারণ পরিচয়-সহ ভারতীয় শক্তি-সাধনার ইতিহাস ও শাক্তপদাবলির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। এই বিভাগে আমরা শাক্ত পদাবলির কবি, কবিত্ব ও অন্যান্য আরও কিছু প্রসঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হব।

### ৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা শাক্তপদাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সহ ভারতবর্ষে শক্তি-সাধনার পশ্চাৎপট, বৈষ্ণব পদাবলি ও শাক্ত পদাবলির তুলনামূলক আলোচনা, শাক্ত পদে লোক-ঐতিহ্যের উপাদান প্রভৃতি আলোচনা করেছি। আলোচ্য বিভাগ থেকে আপনারা আগমনি ও বিজয়া পদের কবি ও কবিত্ব, বাংলা সাহিত্যে শাক্ত সাহিত্যের উত্তরাধিকার এবং আগমনি ও বিজয়া পদের ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবেন।

## ৮.২ আগমনি ও বিজয়া পদের কবি ও কবি-কৃতিত্ব

এবার আমরা আগমনি ও বিজয়া পদের বিশিষ্ট কবি রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কবি-কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

**আগমনি :**

বাংলার শাক্ত সাহিত্যকে আমরা দুইভাবে আলোচনা করি। প্রথমত উমা-সংগীত দ্বিতীয়ত, শ্যামা-সংগীত। উমা- সংগীত পর্যায়ের গানগুলির অন্তর্গত আগমনি ও বিজয়া পর্যায়। এই পর্যায়ের গানগুলি বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বাংলার লোকসাহিত্য ছড়ায়-গানে আগমনি ও বিজয়ার গানগুলি বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত। কাজেই রামপ্রসাদের হাতে ব্যক্তিলিখিত শ্যামা-সংগীতগুলি একটি সুপরিচিত পদাবলির রূপ লাভ করবার আগে থেকেই এই গানগুলি প্রচলিত ছিল। ফলত রামপ্রসাদকে এই পর্বের প্রবর্তক বলা যায় না। লোক ঐতিহ্য থেকে আহরিত পদগুলির ধারায় রামপ্রসাদও আগমনি-বিজয়া নিয়ে বেশ কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্ত পদাবলি' সংকলনে রামপ্রসাদের আগমনি গানের সংখ্যা মাত্র চারটি। এগুলি হল—

১) গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না

২) ওগো রানী নগরে কোলাহল উঠো চলো চলো

৩) আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার

৪) ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।

এদের মধ্যে প্রথম তিনটি গান আগমনি পর্যায়ের আর চতুর্থ গানটি বিজয়া পর্যায়ের। এই সংকলনে সংগৃহীত উপরোক্ত চারটি গানই কাব্য হিসাবে যেমন অসাধারণ, তেমনি আন্তরিকতায়, মা মেনকার মানসিক অবস্থার পরিস্ফুটনে সাবলীল।

রামপ্রসাদের "গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না" গানটি সহজ-সরলভাবে সাধারণ গ্রাম সমাজের কল্যাস্নেহে উদ্বেল এক জননীর মূর্তি তুলে ধরেছে। মেনকা উমাকে আর পতিগৃহে পাঠাবেন না। কিন্তু এতে সমাজ নিন্দার সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাটি মেনকার মনে জেগেছে। তাই তিনি বলেন লোকে মন্দ বললেও সে কথা তিনি শুনবেন না। এমনকি স্বয়ং শিব এসে যদি উমা নিয়ে যেতে চায়, তাঁরা মায়ে ঝিয়ে মিলে শিবের সঙ্গে ঝগড়া করবেন। যে শিব শ্মশানে-মশানে ফেরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না — সেই স্বামীর ঘরে নিজের নয়নের মণি মেয়েকে আর পাঠাবেন না। পদটিতে যে আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে সেই আখ্যানটি গ্রাম-বাংলার দরিদ্র কুটিরে হামেশাই চোখে পড়ে।

আবার "ওগো রানি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল", পদটিতে রামপ্রসাদ সেন মেনকার অপর একটি ছবি এঁকেছেন। এই পদে মেনকা গিরিরানি। ফলে তার কথাবার্তা এবং আচরণও রানির মতই। উমা এসেছে খবর পেয়ে রানি তাকে বরণ করতে ছুটেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে জয়া। সে-ই এ খবরটি দিয়েছে। এই শুভ সংবাদ দেবার কারণে রানি

প্রত্যুত্তরে জয়াকে যে সম্বোধন করেছে তা একই সঙ্গে যেমন মায়ের প্রাণের কথা এবং অন্যদিকে রাজোচিত—

"জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমার অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো।"

রামপ্রসাদের পদে এরকম সমাজ সচেতনতা বার বার দেখা যায়।

'আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার' পদটিতেও উপরোক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য। এই পদে মেনকা এই নিয়ে দুঃখ করেছেন যে, উমার পিতা হিমালয় রাজা, অথচ তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে জন্ম ভিখারির ঘরে। উমা সৌন্দর্যে অপরূপা সুকুমারী। অথচ তাঁর স্বামী দিগম্বর। এই দুঃখে মেনকার প্রাণে শান্তি নেই। এই এক বৎসর উমা কত কষ্ট করে স্বামীর ঘর করেছে। আজ যখন উমা মেনকার কাছে এসেছে— তখন যেন মেনকার শুভনিশি পোহালো। কন্যার মুখ দেখে মেনকা আনন্দাশ্রুতে ভাসেন।

**বিজয়া :**

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে ভয়ে তনু কঁপিছে আমার" পদটি বিজয়া পর্যায়েব পদ। রামপ্রসাদ সেন এই পদে মেয়ের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ স্মরণ করে মেনকার অন্তরে যে শঙ্কা জেগেছে তার একটি অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। দশমীর দিন সকাল বেলা মহাদেব উমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। গৃহদ্বারে বাঘছাল পেতে বসে মহাদেব পার্বতীকে হাঁক ডাক করছেন যাতে গনেশ জননী অতি শীঘ্রে কৈলাস অভিমুখে রওনা হন। শিবের এই হাঁকডাক শুনে মেনকার শরীর কেঁপে উঠেছে। তিনি দিনের বেলা অন্ধকার দেখছেন। তাঁর বুক যেন ফেটে যেতে চাইছে. মেয়ে যে পরের ধন এই কথা জেনেও তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না—

"তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।"

মেনকার এই গভীর বেদনা পাঠককে খুব সহজেই স্পর্শ করে। আর এখানেই রামপ্রসাদের এই পর্বের পদ রচনার চরম সার্থকতা ।

উপরোক্ত গানগুলি ছাড়াও আরও কিছু গান অন্যান্য পদসংকলনে পাওয়া যায়। আগমনি-বিজয়া পর্যায়ে রামপ্রসাদের লেখা এই গানগুলি হল -- 'নিরখি-নিরখি বদন ইন্দু', 'আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়', 'রত্ন সিংহাসনে গৌরী নিকটে মেনকা গিরি', 'দয়াময়ী আইস আইস ঘরে'।

রামপ্রসাদের লেখা আগমনি-বিজয়া পর্যায়ের গানের সংখ্যা অল্প। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক পদের মধ্য দিয়েই রামপ্রসাদ তত্ত্ব সাধনার সঙ্গে বাস্তব-জীবন ও সুখ দুঃখের নিবিড় সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে

লিখেছেন—"বৈষ্ণব পদাবলীর মত রামপ্রসাদের গান বৈকুণ্ঠের গান নয়, তার সঙ্গে ধূলি ও ধরিত্রীর নিবিড় যোগ আছে বলে আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়েও তার কাব্যরস উপলব্ধি করা যায়— যে কাব্য রস বাস্তব-জীবনকে অবধারণ করে আছে। শ্যামার সন্তান রামপ্রসাদ আধ্যাত্ম সাধনা বাস্তবতা ও কাব্যরসের ত্রিবেণী রচনা করে ভক্তির গীতি-সাহিত্যকে নতুন সার্থকতার পথে প্রেরণ করেছেন। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবি অধুনা নাম মাত্র পর্যবসিত, তাঁদের কাব্যদি পড়য়া ছাত্র ও গবেষকের অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রায় দুশ' বছর আগে লোকান্তরিত রামপ্রসাদ সেন এখনও প্রবাদ বাক্যের মতো বেঁচে আছেন, তাঁর অলৌকিক জীবন সম্বন্ধে কত গালগল্প গড়ে উঠেছে। তাঁর গানগুলি উদার আকাশের মতো বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায় মনের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা বিক্ষোভ-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। বাঙালীর হৃদয়ে তাঁর আসন চিরদিন অটুট থাকবে।"

**কমলাকান্ত ভট্টাচার্য :**

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য আগমনি-বিজয়া বিষয়ক পদ রামপ্রসাদের তুলনায় অনেক বেশি রচনা করেছেন। রামপ্রসাদের আগমনি-বিজয়া পর্বের পদগুলির তুলনায় কমলাকান্তের পদগুলি কিছু বিশিষ্ট। কারণ এই সময় আগমনি-বিজয়ার পদগুলি শুধু সাধনা ও উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বরং বাঙালির উৎসব সংগীতে পরিণত হয়েছে। কমলাকান্ত তাঁর পদে এই উৎসবের সুরটিকে যথাসম্ভব ধ্বনিত করতে চেয়েছেন। শাক্ত পদাবলি সংকলনে কমলাকান্তের লেখা আগমনি-বিজয়ার এই পদগুলি পাওয়া যায়।

১) আমি কী হেরিলাম নিশি স্বপন

২) কাল স্বপনে শঙ্করীমুখ হেরি কী আনন্দ আমার

৩) ওহে গিরিরাজ গৌরী অভিমান করেছে

৪) কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে

৫) যাও গিবিবর হে আনো যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার

৬) গিরি প্রাণগৌরী আমার

৭) বারে বারে কয় রানি গৌরী আনিবারে

৮) গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে

৯) গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর করো অনুমতি হর

১০) ওহে হর গদাধর করো অঙ্গীকার

১১) গিরিরানি এই নাও তোমার উমারে

১২) গিবিরানি যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে

১৩) এল গিরি নন্দিনী লয়ো সুমঙ্গল ধ্বনি ঐ-শুন

১৪) আমার উমা এল বলে রানি এলোকেশে ধায়

১৫) শরৎ কমল মুখে আধো আধো রানি এলোকেশে ধায়

১৬) ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান গো

১৭) কী হল নবমী নিশি হইল অবসান গো

১৮) জয়া বলো গো পাঠানো হবে না

১৯) আমার গৌরীরে লয়ে যায় হর আসিয়ে

২০) ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি

এদের মধ্যে প্রথম পনেরটি পদ আগমনি পর্বের এবং শেষ পাঁচটি পদ বিজয়া পর্বের অন্তর্গত।

কমলাকান্ত প্রথম জীবনে "সাধকরঞ্জন" তন্ত্র সাধনার গ্রন্থ কবিতাকারে রচনা করেছিলেন। এই বইটির শেষে তিনি সামান্য কিছু আত্মপরিচয় যোগ করেছিলেন এখান থেকেই তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বর্ধমানে বসবাসকালে তিনি বর্ধমান রাজবাড়ির বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কমলাকান্তের মৃত্যুর পর বর্ধমানের রাজবাড়ি থেকে কমলাকান্তের একটি পদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমানের কালনা গ্রামে। তাঁর জীবন-কথা এখনও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিকতায় বিজরিত হয়ে প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিকা নাকি বাগ্‌দিনী বেশে তাঁর কাছে এসে মাছ জুগিয়েছিলেন। দস্যুর দল তাঁকে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিতে এসে তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে অবশেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এই গল্পগুলি বাংলার জনপদে এখনও সমান জনপ্রিয়।

**আগমনী পর্যায় :**

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশত পদ পাওয়া গেছে। তাঁর মধ্যে আগমনি ও বিজয়া গানগুলি কবিত্বে এবং মানবিক রসে উৎকৃষ্ট। মেনকার দুঃখ বেদনা কন্যা বিরহে মাতার আকুলতা বাঙালি-ঘরের মতোই আন্তরিক হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের পদে। বাঙালি ঘরের বধূটির মতই মেনকা স্বামীর কাছে অনুযোগ করেছেন পাষাণ হৃদয় বলে —

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে!

গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।

এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে,

আধ আধ মা বলি ও বিধু বদনে!"

পিতা মাতা তার খবর নেন না বলে দূরদেশে বিবাহিতা কন্যাটি অভিমান করেছে। দুঃখিনী মায়ের মনে কন্যার এই অভিমান- খিন্ন মুখখানি বড় বেজেছে —

"ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করছে।

মনোদুঃখে নারদে কতনা কয়েছে —

দেব দিগম্বরে সাঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে।"

মেনকা নিতান্ত অবলাকামিনী, নইলে তিনি নিজেই গৌরীকে আনতে যেতে পারতেন। মায়ের ব্যাকুলতার সীমা গিরিরাজ বুঝতে পারতেন না। পাষাণ হৃদয় গিরিরাজের, তাই স্থির রয়েছেন।

"কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,

নারীর জন্মে কেবল যন্ত্রণার সহিতে।

সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,

তুমি হে পাষাণ, তহে না কর মনেতে।"

অবশেষে গিরিরাজ গৌরীকে আনতে কৈলাস রাওনা হয়েছেন কৈলাসে উপস্থিত হয়ে কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গিরিরাজ এবং পার্বতীর এ মিলন দৃশ্যখানি মনোরম —

"হেরি ও তনয়া মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের তিমির গেল দূরে।

জগৎ জননী তায়, প্রণাম করিতে চায়, নিষেধ করবে গিরি ধরি দুটি করে।"

এরপর শিবের অনুমতি নিয়ে পর্বতরাজ কন্যাকে সঙ্গে করে আপন ভবনে যাত্রা করেছেন। পরম রত্ন এনে মানুষ যেমন করে প্রিয়জনকে উপাদার দেয়, গিরিরাজ তেমনি করে উমাধন এনে গিরিরানির হাতে তুলে দিয়েছেন --

"গিরিরানি এই নাও তোমার উমারে।

ধর ধর হবের জীবর-ধন।"

আর বহুদিন পরে কন্যাকে বুকে পেয়ে পর্বত গৃহিণী পুলকিত হয়ে উঠেছেন। প্রেমাশ্রু নীরে মেনকার শরীর ভেসে যায় —

"তখন গৌরী কোলে করি, গিরিনারী প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়।"

কন্যাকে বুকে পেয়ে মেনকা সুখী হয়ে ওঠেন। মেয়েকে কোলে নিয়ে তিনি তার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। আর উমা হাসিমুখে শিব গৃহে তাঁর সুখের কাহিনি মার কাছে বিবৃত করেন। মায়ের কোলে বসে উমা বলছে —

"শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা।

তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী।

মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দ্যাখে

কা'র কে এমন আছে সুখের সতিনী!"

**বিজয়া পর্যায় :**

মা মেয়ের মিলেনর এই আনন্দ কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী পার হয়ে অবশেষে নিতান্ত নিষ্ঠুর নবমী নিশি এসে উপস্থিত হল। মেনকার বুক দুরু দুরু কাঁপছে। কারণ, নবমীর নিশি পোহালেই ডমরু ধর এসে উমাকে নিয়ে যাবার জন্যে হাঁক ডাক শুরু করবে। মায়ের ঘর অন্ধকার করে মেয়ে চলে যাবে কৈলাসপুরে।

মেনকার হৃদয়ের এই আকুলতা হাহাকারের মতো প্রকাশ পেয়েছে এই পদটিতে—

"ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।"

কিন্তু তার এই তীব্র হাহাকারে নবমী নিশি রুদ্ধ হয়ে থাকে না। আর দশমী প্রভাতে অনিবার্য ডমরু বেজে ওঠে আঙিনা প্রান্তে—

"কি হলো, নবমী-নিশি হৈল অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে,
শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ।।"

অবশেষে শিবের সঙ্গে উমা যখন কৈলাস পুরে যাত্রা করেছে, তখন অভাগিনি মেনকা তাঁর আদরের মেয়ের দিকে আরেক বার দেখতে চেয়েছেন—

"ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধু মুখ হেরি;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো?
রতন ভবন মোর আজি হইল অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন।
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা!
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।।"

পিতৃগৃহাগতা কন্যা আবার যখন শ্বশুর বাড়িতে রওনা হয় তখন মায়ের বুকের ভেতরে যে উথালি পাথালি শুরু হয় তার একটি আন্তরিক চিত্র উপরোক্ত পদটি আমরা পেলাম। এই পদটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এ কোনো জটিল তত্ত্ব নয়— এ আমাদের মাটির ঘরের এক কন্যা বিরহিণী মা। তার মায়ের নাড়ি ছেঁড়া ধন স্বামীর ঘরে চলে যাবার সময় মায়ের মনের তীব্র হাহাকার, কন্যা-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বর্তমান পদটিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আগমনি- বিজয়া পর্যায়ের পদগুলিতে কমলাকান্তের এই বৈশিষ্টটি তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রেখেছে।

## ৮.৩ বাংলা সাহিত্যে শাক্ত সাহিত্যের উত্তরাধিকার

আগমনি-বিজয়া পদের প্রবর্তক হিসেবে কোনো একজনের নাম বলা সঠিক নয়। কারণ রামপ্রসাদের আগেও বাংলার লোক-সংগীতের মধ্যে এই ধরনের পদ ছড়িয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'লোক সাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা তার সাক্ষ্য পাই। বরং বলা যায় রামপ্রসাদ সেন প্রথম আগমনি-বিজয়া পদগুলিকে সাধন-সংগীত হিসেবে সুশৃঙ্খলরূপে প্রয়োগ করলেন। পরবর্তীতে কমলাকান্তের হাতে উমা-সংগীত ও শ্যামা-সংগীত দুই জগতের পদেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এরই উত্তরাধিকার প্রবাহিত হয়েছে পরবর্তীকালের মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল — এঁদের রচনার মধ্য দিয়ে— প্রায় দুশো বছর ধরে।

কমলাকান্ত পরবর্তী রাম বসুর পদে আগমনি-বিজয়া একটি বিশিষ্ট রূপ পায়। রাম বসু ছিলেন  সেকালের বিখ্যাত কবি সংগীতকার। যদিও রামপ্রসাদ কমলাকান্তের মতো তিনি সাধক কবি ছিলেন না। তার আগমনি-বিজয়া পদগুলি তাঁর কবিগানেরই অঙ্গ ছিল। কবি-সংগীতের শ্রোতারা ছিলেন নাগরিক মানুষ। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে এই সব গানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশ এবং চিত্ত বিনোদন ঘটত। রাম বসুর ভাষা ভঙ্গি তাই রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের মতো গীতি আঙ্গিকে রচিত নয়। এগুলি রচিত হয়েছে কবি-গানের আঙ্গিকে। রাম বসুর একটি পদাংশ নিচে উদ্ধৃত হল —

"গিরি হে তোমার বিনয় করি আনিতে গৌরী

যাও হে একবার কৈলাসপুরে।

শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দনে আর গঙ্গাজলে

ভুলবে ভোলার মন।

ওমনি সদয় হবে সদানন্দ আসতে দিবেন হারা তারাধন।

এনো কার্ত্তিক গনপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী ভগবতী

এনো মস্তকে করে।

জামাই যদি আসেন এনো সমাদর করে। "

এই সময়ের কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর ও শ্রীধর কহক উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কবি-সংগীত জাতীয় পদের রীতিতে আর যাঁদের আগমনি গান পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গোবিন্দ চৌধুরী, হরিশচন্দ্র মিত্র, অন্ধ চণ্ডী, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, মনোমোহন বসু, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ বৈরাগী, রাজা, মহেন্দ্রলাল খান, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, রামচন্দ্র মালী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, রূপচাঁদ পক্ষী, অক্ষয় সরকার, প্যারীমোহন কবিরত্ন, কালীনাথ রায়, মদন মাস্টার, রসিকচন্দ্র রায়, দাশরথি রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিনাথ মজুমদার, নবীনচন্দ্র সেন, জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আগমনি-বিজয়ার কিছু পদ রচনা করেছিলেন। এগুলি সমকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল — তার মধ্যে একটি —

"জনেক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার?

আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর !

আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি

প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদো নাকো আর।"

কমলাকান্ত বা রাম বসুর পরবর্তী করিবা আগমনি-বিজয়া ধারার প্রচলিত ও পরিচিত ছবিটিকেই তাঁদের নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে উজ্জ্বলতর করেছেন। নতুন রাগভঙ্গি ও আঙ্গিকে বিষয়াটিকে উপস্থিত করেছেন মাত্র। কারণ ভাবনার ক্ষেত্রে এখানে নতুনত্বের

কোন অবকাশ নেই। তার মধ্যেও কিছু কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়ে। হরিশচন্দ্র মিত্র মেনকার মাতৃহৃদয়ের কাতরতা প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

"বাছার নাই সে বরণ নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার চিনে ওঠা ভার
সে উমা আমার উমা নাই হে আর। "

অথবা গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই পদটি কালিকার নিগূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছে —

"কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী
অসিতবরণা উমা, মুর্খে অট্ট অট্টহাসি।
এলো কেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।"

দাশরথি রায় আগমনি-বিজয়ার পদে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাঁর এই পদটি শব্দ ঝংকারে উৎকৃষ্ট—

"কৈ হে গিরি কৈ যে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তা অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?"

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের মেনকা উমাকে বলছে —

"গা তোল গা তোল উমা রজনী প্রভাত হলো
মঙ্গল আরতি হবে উঠ মা সর্বমঙ্গলে।"

একই ধরনের বাক্য পাওয়া যায় দাশরথি রায়ের একটি পদে। প্রতিবেশিনী এক নারী এসে মেনকাকে উমার আগমন বার্তা শোনাচ্ছে —

"গা তোল গা তোল বাঁধো মা কুন্তল
ওই এল পাষাণী তোর ইশানী ।"

নবীনচন্দ্র সেন কিছু আগমনি-বিজয়া বিষয়ক পদ লিখেছিলেন—

"দেখো আয় তোরা হিমাচলে
ওকি আলো ভাসে রে!
উমা আমার আসে বুঝি,
উমা আমার আসে রে !"

বিজয়া পর্বে মধুসূদন দত্তের একটি কবিতা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল —

"যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।

গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।"

প্রায় একই কথা শোনা যায় হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল ফিকিরচাঁদ) এর পদে —

"শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে।"

পরবর্তীকালে আগমনি-বিজয়া পর্বের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত না হলেও ভাবের দিক থেকে কাছাকাছি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন অনেকেই। রচিত হয়েছে শ্যামা-সংগীত। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকে শ্যামা বিষয়ক কয়েকটি গানের দেখা মেলে। তাছাড়া নজরুল ইসলাম এই বিষয়ে অজস্র সংগীত রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আগমনি-বিজয়া পর্বের উমা-সংগীতগুলি বাংলার প্রাণের ধন, বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত রচনা করতে গেলে বাংলার মা-মেয়ের সম্পর্কে তত্ত্বটি জানতে গেলে উমা-সংগীতের ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। তাই বাংলা কবিতায় আগমনি-বিজয়া ভাবের কবিতা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে — বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন আঙ্গিকে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

"আগমনী-বিজয়াতে বাস্তব মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা চমৎকার ফুটেছে। শাক্ত পদকারগণ মাটির মাকে সামনে রেখে এ গানগুলি লিখেছিলেন, তৎকালীন বাংলাদেশের মায়েদের বেদনার কথাই এতে ফুটে উঠেছে। তাই বৈষ্ণব পদাবলী ভাববৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণের সুক্ষ্মরসোত্তীর্ণ প্রেমগীতিকা, আর শাক্ত পদাবলী বাস্তব বাংলাদেশের বাস্তব মায়ের বেদনার গান। একটি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে, আর একটি মর্ত্য থেকে স্বর্গের দিকে হাত বাড়িয়েছে। একটির (বৈষ্ণব) মূল রস আদিরস— তাই-ই ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, আর, একটির (অর্থাৎ শাক্তপদ) মূল রস বাৎসল্য রস— তাও ভক্তিতে পরিণত হয়েছে।

—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'।

## ৮.৪ আগমনি ও বিজয়া পদের ছন্দ ও ভাষা

আগমনি ও বিজয়া পর্বের পদগুলি মূলত সংগীত। সংগীত রচনার উদ্দেশ্যেই এগুলো রচিত হয়েছে। এই কারণে কবিতা বা পদ্যছন্দ যথাযথভাবে এই পদগুলিতে পাওয়া যাবার কথা নয়। এমনকি শাক্ত পদাবলির অন্যান্য পদের তুলনায়ও আগমনি-বিজয়া পর্ব স্বতন্ত্র। ভক্তের আকুতি, জগৎ জননীর রূপ অথবা পর্বের গানগুলির আঙ্গিকগত পার্থক্য দৃশ্যমান। যাইহোক আমরা প্রথমে সংগীতাকারে উপস্থিত আগমনি-বিজয়া পর্বের পদগুলির রচনায় ছন্দের প্রেরণাটি লক্ষ করবার চেষ্টা করব।

আগমনি পর্বে রামপ্রসাদের একটি পদ প্রথমে আলোচনা করা যাক।

"গিরি, এবার আমার মা এলে, আর উমা পাঠাব না।

বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।।

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—

এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,

শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।।"

রামপ্রসাদ সেনের এই পদটি আগমনি গান হিসাবে খুবই জনপ্রিয়। রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত বিশেষ সুরে ও বিশেষ ঢঙ্গে এই গানটি গাওয়া হয়। পদটিতে স্বরবৃত্ত বা লৌকিক ছড়ার ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। স্বরবৃত্তের চার ৪+৪+৪+৪ এই ভাবে পর্ব ভাগ করলে পদটির আভ্যন্তরীণ ছন্দের ঝোঁকটি উপলব্ধি করা যায় —

গিরি, এবার আমার / উমা এলে / আর উমা / পাঠাব না।

বলে বল্‌বে / লোকে মন্দ / কারো কথা / শুনব না ।।

উদাহরণের, 'আর উমা' অংশটি ছন্দের প্রয়োজনে একটু দীর্ঘ উচ্চারণ করলেই পদটি ৪ মাত্রা হবে। "শুনব না " অংশটিও তাই।

শাক্ত পদাবলির কবিরা বেশির ভাগই সংগীত জগতের মানুষ। দু-একজন ছাড়া কবিতার জগতে পদ-চারণা কেউ করেননি। ফলে বেশির ভাগ পদে কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ না করে, কবিরা গানের আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন। এরই ফলে ছন্দোবন্ধের কোনো কোনো অংশে আরোপিত ঝোঁক বা প্রলম্বন দেখা যায়। যেমন অজ্ঞাত নামা এক কবির আগমনি পদ —

বদন তোল / মদন-রিপু / যাব পিতার / বসতি।

নগেন্দ্র এ / সেছেন নিতে/ , যোগীন্দ্র দেও / অনুমতি ।।

এখানেও প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বে বসতি শব্দটিতে এমনিতে তিন মাত্রা, কিন্তু একটু প্রলম্বিত করে একে চার মাত্রায় উচ্চারণ করতে হবে। ফলে এই পদটিও স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দের প্রেরণায় রচিত হয়েছে বলে মনে হয়।

দাশরথি রায়ের একটি পদেও এই ছন্দের স্পন্দন আমরা লক্ষ করি —

কৈ হে গিরি / কৈ সে আমার / প্রাণের উমা / নন্দিনী!

সঙ্গে তব / আঙ্গনে কে / এলো রণ / রঙ্গিণী?

এরকম উদাহরণ আরও ছাড়িয়ে সমগ্র আগমনি- বিজয়া পর্বে। এছাড়া দীর্ঘ ত্রিপদী বা লাচাড়ী ছন্দে রচিত হয়েছে বহু পদ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার?" পদটি দীর্ঘ চৌপদীতে রচিত।

সনেট্ আঙ্গিকেও রচিত হয়েছে দু-একটি পদ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত আগমনি-বিজয়া গান খুব বেশি লেখেননি। সনেট্ আকারে লিখিত একটি কবিতা কিন্তু বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। অক্ষর বৃত্তের পয়ার ছন্দে, চৌদ্দ মাত্রায় চৌদ্দ পঙ্‌ক্তিতে রচিত এই সনেটটি অনেকেরই জানা।

"যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারা দলে

গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!

উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,

নয়নের মনি মোর নয়ন হারাবে!"

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সংগীতে সুরের প্রয়োজনে অনেক সময় শব্দকে ভেঙে, ছন্দোবন্ধের বিচ্যুতি ঘটিয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। সুরের প্রয়োজনে এরকম পরিবর্তন আমরা রবীন্দ্রসংগীতেও লক্ষ করেছি। তাছাড়া একটা ছন্দোবন্ধ দিয়ে শুরু করে আগমনি-বিজয়া পর্বের করিবা অনেক সময়ই সেই ছন্দোবন্ধ আর অটুট রাখার চেষ্টা করেননি। পদের শেষাংশে তাঁরা শুধু সুরের প্রবাহে কথা বসিয়ে গেছেন।

সেই সময় বাংলায় যারা কবি সংগীত রচনা করতেন তাদের হাতে প্রচুর আগমনি পদ রচিত হয়েছে। এর ফলে কবি-গানের রীতি এবং আঙ্গিক প্রবেশ করেছে এই পর্বের গানগুলিতেও। হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক রূপচাঁদ পক্ষী, দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চৌধুরী, হরিশচন্দ্র মিত্র — প্রমুখ যারা কবি-সংগীত রচনা করতেন অথবা কবি সঙ্গীতের রীতিতে আগমনি-বিজয়ার গান রচনা করেছেন।

রাম বসুর একটি পদে কবিগানের রীতিটি বেশ পরিস্কার। শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকারের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ এই রীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য —

"গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,

যাও হে একবার কৈলাসপুরে।

শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,

ভুলবে ভোলার মন।

অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন

হারা তারাধন।

এনো কার্তিক গনপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী

এনো মস্তকে করে।

জামাই-যদি আসেন, এনো সমাদর করে। ..."

অবশ্য বিজয়া পর্যায়ে কবি গানের এই রীতিতে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না। সংগীত বা কবি সংগীত রীতিতে রচিত পদগুলিতে পদের স্থায়ী অংশটি অর্থাৎ প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ধ্রুব পদ হিসেবে রচিত হয়। এর পর প্রতিবার অন্তরা বা আভোগ শেষ করে ধ্রুব পদে ফিরতে হয় রামপ্রসাদ সেনের এই পদটিতে ---

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।

বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না ।। ধ্রু।।

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়

উমা নেবার কথা কয়—

এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্ বনা ।।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়,

এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,

শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ।।"

এই গানটিতে প্রথম দুটি চরণ হল 'স্থায়ী'। এটিই ধ্রুব পদ বা ধুয়া। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ হল অন্তরা। অন্তরা শেষ করে আবার প্রথম দুই চরণ অর্থাৎ ধ্রুব পদে পড়তে হয়। এইভাবে ক্রমশ সঞ্চারী ও আভোগ অংশগুলি শেষ করেও প্রতিবার ধ্রুব পদে ফিরতে হয়। সংগীত শাস্ত্রে সাধারণত চরণের শেষ দুইটি দাড়ি (।।) দিয়ে এই, স্থায়ী, সঞ্চারী, আভোগের, বিভাজনে দেখানো হয়। উপরের পদটিতেও আমরা তাই দেখিয়েছি।

একইভাবে কবিগানের গায়েন রীতিতেও এইরকম স্তবক বিন্যাস দেখা যায়। তবে কবি গানের ক্ষেত্রে এই বিভাজনগুলিকে স্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি নামে উল্লেখ না করে- মহড়া, চিতান, পরচিতান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

কমলাকান্তের দু-একটি পদে কবিগানের রীতিটি চোখে পড়ে। এই রীতি ছাড়াও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয় মাত্রার সমমাত্রিক পর্ব অনেকের পদেই চোখে পড়ে। যেমন রাম বসুর—

(মরি) জামাতার খেদে / তোমার বিচ্ছেদে / প্রাণ কাঁদে দিবা / নিশি।

অথবা হরু ঠাকুরের এই পদটিতে —

(তুমি) না এলে এখন / যেত মা জীবন / মায়ে ঝিয়ে দেখা / হত না।

এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি পদ রচিত হয়েছে চতুষ্পদিতে --

যার মায়া প্রকাশিতে, / জন্ম নিলে অবনীতে, ৮ + ৮

কে তোমার মাত-পিতে, / কন্যা তুমি কার ! ৮ + ৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে প্রযুক্ত 'গৈরিশ ছন্দ' আগমনি-পদে দেখা না গেলেও তাঁর একটি পদে অক্ষরবৃত্তেরই একটি ছন্দোবন্ধ দেখা যায়—

এলোকেশী বিবসনা / উমা আমার শবাসনা,

ঘোরাননা ত্রিনয়না / ভালে শোভে বাল-শশী।

উদাহরণটিকে ৮ + ৮/৮ + ৮এই ছন্দোবদ্ধে এনে চতুষ্পাদির উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। যদিও "উমা আমার শবাসনা" অংশটিকে অক্ষরবৃত্তের নিয়মে কিছুতেই আট মাত্রায় আনা যায় না। মাত্রা সংকোচন করে 'আমার' অংশটি স্বরবৃত্তের নিয়মে ধরলে তবেই এটি আট মাত্রায় দাঁড়ায়। অবশ্য আমরা আগেই বলেছি সংগীতের প্রয়োজনে এরকম মাত্রার হেরফের পদাকারদের করতে হয়েছে।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা তাঁদের সময়ের ভাষা। রামপ্রসাদের জন্ম ১৭২০-২১ খ্রিস্টাব্দে, হালি শহরে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ তিনি দেহ রক্ষা করেন। অন্যদিকে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে, হরু ঠাকুরের জন্ম ১৭৩৮। গদাধর মুখোপাধ্যায় ১৭৪৬, রাম বসুর জন্ম ১৭৮৬, রায়বসুর জন্ম ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় বাংলা লিখিত সাহিত্যের ভাষায় কিন্তু তখনও সাধুরীতির অনুবর্তন চলছে। অপরদিকে রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে পরবর্তী আগমনি-বিজয়া পদকারদের ভাষা মুখের ভাষার অনেক কাছাকাছি।

তার, একটি কারণ এই গানগুলি লোক-ঐতিহ্যের একটি অঙ্গকেই পুষ্ট করে এসেছ। ফলে লোক-গানের মতো আগমনি-বিজয়া গানেও নানা রকম লৌকিক শব্দবন্ধ এবং আটপৌঢ়ে মুখের ভাষা অনায়াসে ব্যবহৃত হয়েছে। আগমনি-বিজয়ার বিষয়বস্তু বাংলার আটপৌঢ়ে ঘটনা। তত্ত্ব ও দর্শনের ঘোর কুজ্ঝটিকা এই পদগুলিতে নেই। মাতৃহৃদয়ের স্নেহ -মমতা-বেদনা , মা ও মেয়ের মান-অভিমান, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ এই পদগুলির মধ্যে ধৃত হয়ে আছে। এই কারণে আগমনি-বিজয়া পদের ভাষা আমাদের প্রাত্যাহিক ঘরোয়া ভাষা। লৌকিক বাগ্‌ধারা, মৌখিক শব্দ ভাণ্ডার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আগমনি - বিজয়া গানে স্থান পেয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে --

১) এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না। (রামপ্রসাদ)

২) মনে বড় ভয় বাসি। (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ)

৩) গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল ....। (দাশরথি রায়)

৪) জামাই সে ত পেটের ছেলে, দোষ কি হবে হেথা এলে। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

এরকম উদাহরণ আগমনি-বিজয়া পর্বে প্রচুর রয়েছে। এই সব বাক্য বন্ধ, মৌখিক ভাষা এবং গাঢ়স্থ্য শব্দাবলি আগমনি-বিজয়া পদগুলিকে প্রাত্যদিক বাস্তব করে তুলেছে।

## ৮.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা শাক্ত পদাবলির সাধারণ পরিচয়-সহ ভারতবর্ষের শক্তি-সাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে শাক্ত পদাবলির তুলনামূলক আলোচনা, শাক্ত পদে লোক-ঐহিত্যের উপাদান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি। আলোচ্য বর্তমান

বিভাগে আমরা প্রথমেই আগমনি ও বিজয়াপদের কবি ও কবি-কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ-প্রসঙ্গে কবি রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কবি কৃতিত্ব তুলে ধরেছি। তারপর পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে শাক্ত সাহিত্যের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা জানি যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এই বিশিষ্ট শাখা আধুনিক যুগের বহু কবিদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সবশেষে আমরা আগমনি-বিজয়া পদের ছন্দ ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছি।

## ৮.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১) **রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য** : আগমনি-বিজয়া পদের কবি ও কবিত্ব অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২) **মেনকা** : গিরিরাজ হিমালয়ের পত্নী; উমার জননী

৩) **গিরি** : গিরিরাজ, হিমালয়; গৌরীর পিতা। ব্যঙ্গার্থে মেনকা অনেক সময় তাকে "পাষাণ" বলে সম্বোধন করেন (প্রস্তর নির্মিত অর্থে)।

৪) **চতুর্মুখ** : চার মুখ বিশিষ্ট; ব্রহ্মা।

৫) **পঞ্চমুখ** : পঞ্চমুখ বিশিষ্ট; শিব।

৬) **বিল্বমূল** : বেলগাছ। বোধনের দিন দেবীকে বিল্বপত্রে স্থাপন করে জাগিয়ে রাখা হয়।

৭) **মৃত্যুঞ্জয়** : (বিষ পান করেও) মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি ; মহাদেব ; শিব, কৃত্তিবাস, শঙ্কর ভোলানাথ, হর, ত্রিপুরারি,যোগীন্দ্র, গঙ্গাধর।

৮) **চৈতন্যরূপিনী** : দেবী দুর্গাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তিনি সর্বজগতের চেতনা সম্পাদন করেন, ফলে এরকম নাম হয়েছে।

৯) **হেরম্ব** : গনেশ; উমা-মহেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র ।

১০) **মঙ্গলা** : দেবী দুর্গার অন্য নাম ; জয়ন্তী, কালী, কপালিণী, ভগবতী, চণ্ডী, এলোকেশী, তারা, ঘোরাননা, সিংহবাহিনী, হেমাঙ্গী, ত্রৈলোক্যতারা, ত্রিনয়নী, ভবতারিণী, ভবানী ইত্যাদি অনেক নামে উমাকে অভিহিত করা হয়েছে।

১১) **কৈলাসপুর** : কৈলাস পর্বত; শিবের বাসস্থান।

১২) **সুরধুনী** : গঙ্গা; স্বর্গ থেকে অবরণকালে ইনি শিবের জটায় অবস্থান করেন; হনি গৌরীর সপত্নি।

১৩) **সপ্তমী** : সংগীতে আগমনি শব্দের পরিবর্তে 'সপ্তমী' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

## ৮.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১) ভারতীয় শক্তিসাধনার ধারায় শাক্ত পদাবলির স্থান নির্ণয় করুন।

২) বাংলা বৈষ্ণব পদাবলি এবং শাক্ত পদাবলির একটি তুলনামূলক আলোচনা করে আগমনি-বিজয়া পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৩) আগমনি-বিজয়া পর্বের পরিচয় দিন। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর কাব্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪) 'উমা-সংগীত' ও 'শ্যামা-সংগীত' বলতে কী বোঝায়? 'উমা-সংগীত' বাংলার লোক ঐতিহ্যে পূর্ব থেকেই ছিল — এ কথার যথার্থতা বিচার করুন।

৫) আগমনি ও বিজয়া পর্বে লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৬) আগমনি-বিজয়া পদ রচনায় পদকর্তা রামপ্রসাদের বিশেষ কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭) আগমনি-বিজয়ার পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৮) "শাক্ত পদাবলি বাস্তব বাংলাদেশের বাস্তব মায়ের বেদনার গান" — আগমনি ও বিজয়া পর্বের পদগুলি অবলম্বন করে সমালোচকের এই মন্তব্যের যথার্থ্য বিচার করুন।

৯) বাংলা সাহিত্যে আগমনি ও বিজয়া পর্বের রামপ্রসাদ - কমলাকান্তের উত্তরধিকারী কারা? পদকর্তাদের নাম উল্লেখ করে যে কোন দুজন কবির কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০) আগমনি-বিজয়া পর্বের ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১১) আগমনি পদ বলতে কী বোঝায়? বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আগমনি পদগুলির উত্তরধিকার আলোচনা করুন।

১২) বিজয়া পর্বের পদগুলির এরকম নাম হবার কারণ কী? বিজয়া পর্যায়ের যে কোন একজন কবির কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

১৩) **টীকা** : মেনকা; গিরি; রামপ্রসাদ সেন; কমলাকান্ত ভট্টাচার্য; নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; আগমনী-বিজয়া। রাম বসু; দাশরথি রায়; মধুসূদন দত্ত সপ্তমী; সুরধুনী; উমা-সংগীত, শ্যামা-সংগীত; উমা; নবমীনিশি, শবাসনা, হরু ঠাকুর; শ্রীধর কথক।

## ৮.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১) শাক্ত পদাবলী : শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত) : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০

২) শাক্ত পদাবলী : অরুণকুমার বসু : গ্রন্থ বিকাশ : কোলকাতা, ২০০৮।

৩) ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত : সাহিত্য সংসদ: কোলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৪) শাক্ত পদাবলী সাধনতত্ত্ব ও রস-বিশ্লেষণ : ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : এস, ব্যানার্জি অ্যণ্ড কোং, কোলকাতা, ১৩৬৯ সন ।

৫) শক্তিগীতি-পদাবলী : অরুণকুমার বসু : পুস্তক বিপণি : কোলকাতা, ১৯৯২

৬) বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত : অরুণকুমার বসু : দেজ পাবলিশিং : কোলকাতা ১৯৯৪।

৭) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় : অক্ষয়কুমার দত্ত : ১ম ও ২য় খণ্ড: বিনয় ঘোষ সম্পাদিত: পাঠভবন: কোলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৮) লোকসাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ্রাম্য সাহিত্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ঃ রবীন্দ্র রচনাবলি-৬ : বিশ্বভারতী সংস্করণ।

৯) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা: লিঃ কোলকাতা, ২০০৫।

* * *